ডিসেম্বর ২০১৭ ■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

বিজয়ের ৪৬ বছরে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা

৭ মার্চের ভাষণের ইউনেস্কোর স্বীকৃতি উদ্‌যাপন

লিট ফেস্ট : বাংলার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের মেলবন্ধন

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ছয় দফা ও আমাদের স্বাধীনতা

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন, কিনুন ও লেখা পাঠান

লেখা পাঠাতে ই-মেইল করুন
email : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com

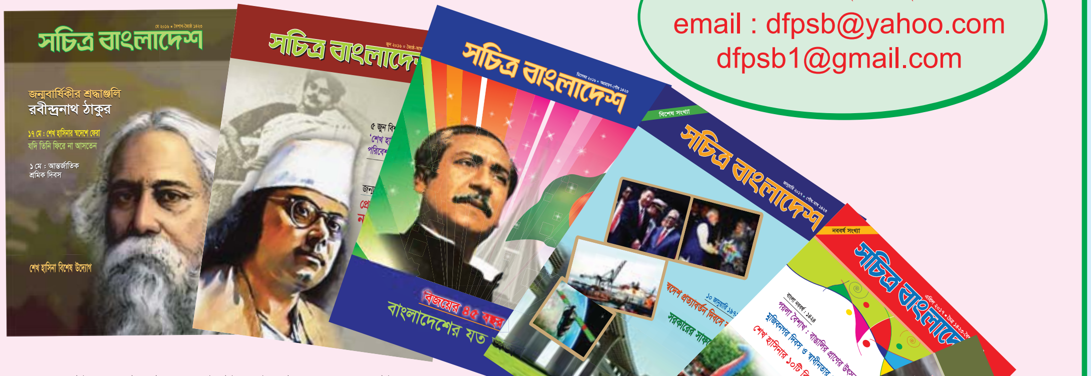

- গ্রাহকগণের যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদে বা মানিঅর্ডারে গ্রাহকমূল্য পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি প্রতি মাসে ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- ক্রয়, এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৭ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৪

৪ ডিসেম্বর ২০১৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর , মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড়ো বিজয় অর্জিত হয়েছিল। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এদিন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির নেতৃত্বে বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে আত্মসমর্পণ করে প্রায় ৯২ হাজার পাকসেনা। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন-সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। বাঙালি জাতি পায় জাতীয় সংগীত ও মানচিত্র ।জাতি এবার পালন করছে বিজয়ের ৪৬ তম বার্ষিকী। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আপোশহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব সমগ্র বাঙালি জাতিকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল বিজয়ের লক্ষ্যে। বিজয়ের এই দিনটিতে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অকুতোভয় লাখো শহিদকে। মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বিদগ্ধজনের লেখা নিবন্ধ, প্রবন্ধ নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ* সংখ্যাটি।

এদেশের স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু আর তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ একসূত্রে গাঁথা। এই ভাষণের মধ্যেই নিহিত ছিল এদেশের স্বাধীনতা ও সশস্ত্র সংগ্রামের কথা। বাঙালি জাতিকে উদ্দীপ্ত করেছিল ৭ মার্চের ভাষণ। এই ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি বাঙালির জন্য গৌরবের ও অহংকারের। এ সংখ্যাটিতে রয়েছে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্যোগে ইউনেস্কোর ৭ মার্চের ভাষণ স্বীকৃতি উদ্‌যাপন নিয়ে একটি লেখা।

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের মেলবন্ধন 'সপ্তম ঢাকা লিট ফেস্ট'। আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য শব্দের শক্তিকে উদ্‌যাপন করা, শব্দের শক্তি যে পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে তা লেখক-পাঠক-বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে উপলব্ধি করা ও তার পথ খুঁজে বের করা। এ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে। পাঠকের প্রতি রইল বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক**
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূ চি প ত্র

৭ই মার্চের ভাষণ ৪

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণের ইতিহাস ৮

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শ্রেষ্ঠ অর্জন ৯
খালেক বিন জয়েনউদদীন

৭ মার্চের ভাষণের ইউনেস্কোর স্বীকৃতি উদ্‌যাপন ১২
রেহানা শাহনাজ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা : প্রাসঙ্গিক ভাবনা ১৪
শামসুজ্জামান খান

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ ১৬
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

চড়ারহাট গণহত্যা ১৯
ডা. নূরল হক

বঙ্গবন্ধু এবং চলচ্চিত্র উন্নয়ন ২০
অনুপম হায়াৎ

বিজয় দিবস বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা ২১
মাহবুব রেজা

বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যা ২৪
আসাদুজ্জামান চৌধুরী

ড. আহসান এইচ মনসুর ২৬

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ঢাকার জাদুঘর ২৮
বরুণ দাস

বাংলার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের মেলবন্ধন ৩২
নাজমা ইসলাম

ঔষধ শিল্পের আদি কথা ৩৪
নাজনীন সুলতানা নীতি

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা ৩৬
কমল চৌধুরী

আজও বাঙালি নারীর প্রেরণা ৩৯
রোকেয়া আক্তার

স্মৃতি ঘেরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ৪২
এফ রহমান রূপক

ছয় দফা ও আমাদের স্বাধীনতা ৪৩
সাদিয়া সুলতানা

গল্প

আলো দেখা ৪৪
সেলিনা হোসেন

কবিতাগুচ্ছ ৪৫-৪৮
নির্মলেন্দু গুণ, নাসির আহমেদ, জাকির আবু জাফর, জুননু রাইন, কনক চৌধুরী, সাঈদ তপু, সাদিয়া সুলতানা, রুস্তম আলী, মাইন উদ্দিন আহমেদ, তাহমিনা বেগম, শাহনাজ, জাহানারা জানি, বোরহান মাসুদ

হাইলাইটস

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৪৯
প্রধানমন্ত্রী	৪৯
তথ্যমন্ত্রী	৫০
জাতীয় ঘটনা	৫১
উন্নয়ন	৫২
আন্তর্জাতিক	৫৩
শিক্ষা	৫৪
স্বাস্থ্যকথা	৫৪
সংস্কৃতি	৫৫
যোগাযোগ	৫৬
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৫৬
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৫৭
কৃষি	৫৭
পরিবেশ ও জলবায়ু	৫৮
জেন্ডার ও নারী	৫৯
ইতিহাস ও ঐতিহ্য	৬০
নিরাপদ সড়ক	৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন	৬১
সামাজিক নিরাপত্তা	৬২
শিল্প-বাণিজ্য	৬২
মাদক প্রতিরোধ	৬৩
চলচ্চিত্র	৬৩
ক্রীড়া	৬৪

বিজয়ের ৪৬ বছর

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শ্রেষ্ঠ অর্জন

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর আমরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দখলদার পাকিস্তানি সৈন্য ও এদেশীয় দালালদের পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেছিলাম। দেখতে দেখতে ৪৬ বছর হয়ে গেল। আর ৪ বছর হলে অর্ধশত বছর হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা যারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিজয়ের পরম প্রাপ্তিতে গৌরব অনুভব করছি। এ বিজয় ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া। এ বিজয় ২ লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত। সর্বোপরি বাঙালির ২ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ফসল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনতে কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে রূপ নিয়েছে। ’৭৫ থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত ২১ বছরের কালো সময়টা বাদ দিয়ে বাকি বছরগুলোতে আমরা কী অর্জন করেছি। তা নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-৯।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এক নবদিগন্ত উন্মোচনকারী ঘটনা। আমাদের এই উপমহাদেশ দীর্ঘদিন ছিল পরাধীন। ফলে এই অঞ্চলে সামাজিক জাগরণ এবং শিক্ষাদীক্ষার তেমন প্রসার ঘটেনি। পূর্ববাংলার অবস্থা ছিল আরো করুণ। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার বাঙালির জাতিসত্তা গঠন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আকস্মিক ছেদ পড়লেও ১৯৪০-এর দশক থেকেই তা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-১৪।

লিট ফেস্ট

বাংলার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের মেলবন্ধন

১৬ নভেম্বর ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে সপ্তম ঢাকা লিট ফেস্ট। লিট ফেস্ট– আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, শব্দের শক্তিকে উদ্‌যাপন করা, শব্দের শক্তি যে পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে তা লেখক-পাঠক ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে উপলব্ধি করা।

বাংলা ভাষা বিশ্বের সপ্তম ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। বহুসংখ্যক মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে– এই বাংলা ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্বকে জানাতে হবে, জানতে হবে। এই লক্ষ্যেই আন্তর্জাতিকভাবে আয়োজিত হয় এই পাঠক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী সমাবেশ। আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব সপ্তম ঢাকা লিট ফেস্ট নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-৩২।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড
ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

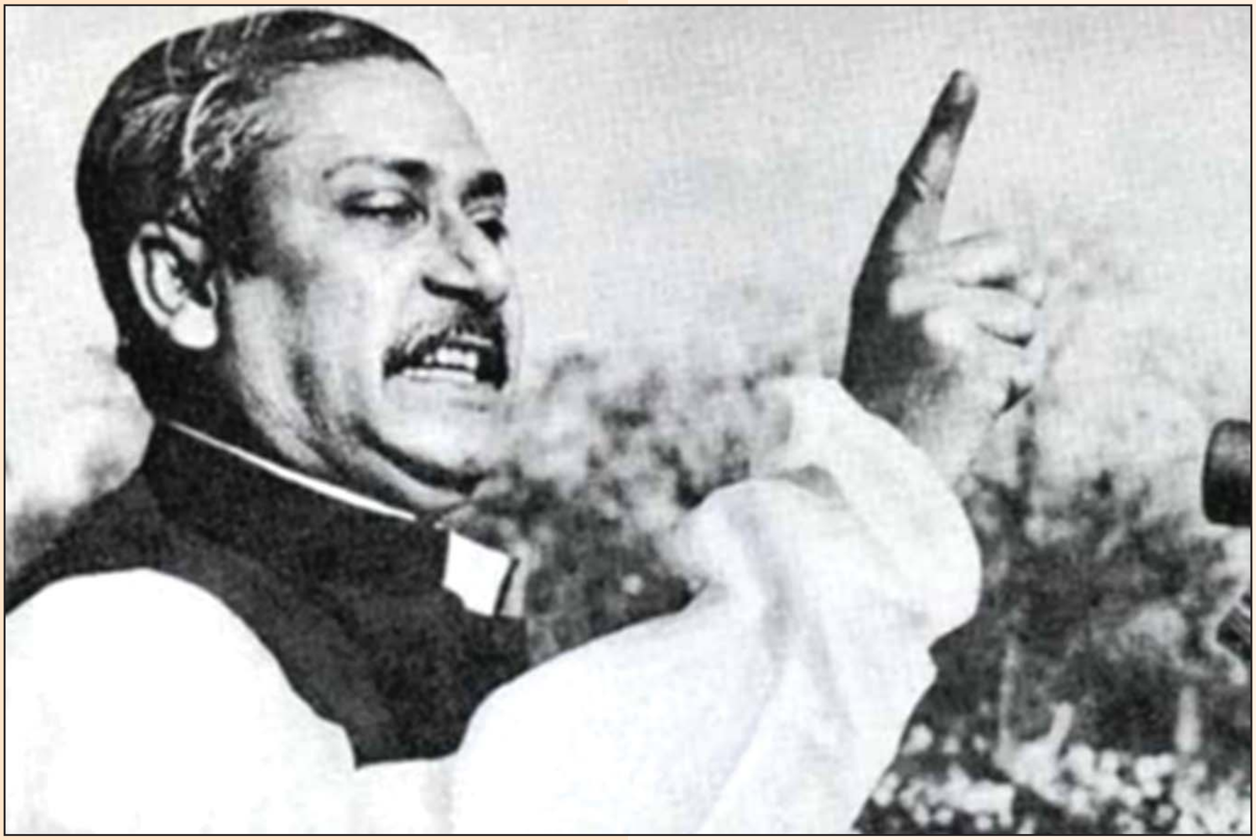

৭ই মার্চের ভাষণ

রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা, ৭ই মার্চ ১৯৭১

ভায়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে । আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়।

কী অন্যায় করেছিলাম? (আপনারা) নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে (আপনারা) ভোট দেন। আমরা ভোট পাই। আমরা দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলায় অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস, এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি । ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল 'ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন– গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো– আপনারা জানেন। দোষ কি আমাদের? (আজকে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আপনারা জানেন, আলাপ-আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে, তিনি মেনে নিলেন (মেনে নিলেন)। (তিনি) তারপরে আমরা বললাম, ঠিক আছে– আমরা এসেমব্লিতে বসবো, আমরা আলোচনা করবো। আমি বললাম– বক্তৃতার মধ্যে, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো, এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর নেতা নিয়াজী খানের সঙ্গে আলাপ হলো, মুফতি বালুচ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করলাম– আসুন, বসি। জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে ছয় দফা-এগার দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে, এটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার ক্ষমতা

Declaration of Independence

‘THIS MAY BE MY LAST MESSAGE, FROM TODAY BANGLADESH IS INDEPENDENT. I CALL UPON THE PEOPLE OF BANGLADESH WHEREVER YOU MIGHT BE AND WITH WHATEVER YOU HAVE, TO RESIST THE ARMY OF OCCUPATION TO THE LAST. YOUR FIGHT MUST GO ON UNTIL THE LAST SOLDIER OF THE PAKISTAN OCCUPATION ARMY IS EXPELLED FROM THE SOIL OF BANGLADESH AND FINAL VICTORY IS ACHIEVED.’

[Message embodying declaration of Independence sent by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to Chittagong shortly after midnight of 25th March, i.e. early hours of 26th March, 1971 for transmission throughout Bangladesh over the ex-EPR transmitter.]

Source: Bangabandhu Speaks, A Government Publication, 1972 (BGP-71/72-2787F-3M)

স্বাধীনতার ঘোষণা

‘এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।’

সূত্র : বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০১২

আমার নাই। আপনারা আসুন, বসুন, আমরা (আমরা) আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে (আমাদের) আমাদের ওপরে তিনি দোষ দিলেন, এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। তারপরও যদি কেউ আসে তাকে ছন্নছাড়া (ছন্নছাড়া) করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে– যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না। তারপরে বন্ধ করে দেওয়ার পরে এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল, আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমাদের (যাদের) অস্ত্র নাই (আমাদের হাতে), জামার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিবদুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে– তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু– আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এ দেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই, আমি বলেছি তাদের কাছে এ কথা, যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে, তা থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।

তারপরে উনি বললেন (যে আমার নামে বলেছেন), আমি নাকি (বলে) স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি উনাকে এ কথা বলে দেবার চাই– আমি তাঁকে তা বলি নাই। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়, তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কীভাবে আমার গরিবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে, কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তারপরে আপনি ঠিক করুন– আমি এই কথা বলেছিলাম।

তিনি বললেন, (আমি নাকি তাকে) তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন (নাকি) যে আমি আরটিসিতে বসব। আমি তো অনেক আগে বলেছি যে কীসের আরটিসি, কার আরটিসি, কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? আপনি আসুন, দেখুন, জাতীয় পরিষদের জন্য আমার লোকেরা রক্ত দিয়েছে। (সত্য কথা ... তারপরে আজকে আজকে আমার যখন ... এসেমব্লি ... এসেমব্লি ... তিনি ২৫ তারিখে এসেমব্লি ... এরপরে আপনারা জানেন, আমি কলাম, আমি কলাম ... পল্টন ময়দানে ... আমি বললাম, সবকিছু বন্ধ ... আমি বললাম, সবকিছু বন্ধ, সরকারি অফিস বন্ধ, ... আমি বললাম, ...আমার কথা তারা মানলো, তখন আমাকে বলল, এই আপনারা আমাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, আপনারা আমি বললাম, কোনো সরকারি অফিস চলবে না। কোনো কিছু চলবে না। তবে কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হবে, আমি ডিসকাস করলাম যে, এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেইভাবে চলল!)

আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে

৭ মার্চ ১৯৭১ : রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়াদী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণরত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেমব্লি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন। আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের। (উনি ... দিলেন ... রাষ্ট্র কার ...?) গোলমাল হলো উনার পশ্চিম পাকিস্তানে, গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষকে।

আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি, এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ভায়েরা আমার,

২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে এসে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন, 'মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর, জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসা, (আমরা) এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না। জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।

ভায়েরা আমার,

(তোমরা) আমার ওপর বিশ্বাস আছে? (... জনতার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ...) আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব– আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের- গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য যে যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল- কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে– শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, (তারপর আর কী) সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়– তোমাদের (উপর) কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি– তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভালো হবে না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগ অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, অন্য যারা এজন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন, মনে রাখবেন। আর সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্টে বা জজকোর্টে দেখা না হয়। দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো– কেউ দেবে না।

আপনারা আমার ওপর ছেড়ে দেন, আন্দোলন কী করে করতে হয়। শোনেন, মনে রাখবেন, একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, পাইক ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়– মনে রাখবেন।

দ্বিতীয় কথা হলো এই– যদি আবার কোনো রকমের কোনো আঘাত আসে, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে, মনে রাখবেন– একটা কথা অনুরোধ করছি, (এটা অত্যন্ত শক্ত কথা এই যে, কিন্তু) সামরিক বাহিনীর লোকেরা কোনো জায়গা থেকে অনর্থক ঘোরাফেরার চেষ্টা করবেন না। তাহলে দুর্ঘটনা হলে আমি দায়ী হব না।

প্রোগ্রামটা বলছি আমি, শোনেন। রেডিও, টেলিভিশন, নিউজ পেপার– মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। (রেডিওতে যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয় কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। টেলিভিশনে যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।) দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনাপত্র নেবার পারে, কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাস হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেশুনে কাজ করবেন, আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ভায়েরা আমার,

(আমার কাছে) এখন শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে, (এই-) আপনারা আমার এইগুলি চালায়ে দেন, কারো হুকুম মানতে পারবেন না। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না, জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না। যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।

দ্বিতীয় কথা– প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণের ইতিহাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিএফপ্পির চলচ্চিত্র শাখার কর্মকর্তা জনাব মহিবুর রহমান খায়ের (প্রয়াত অভিনেতা আবুল খায়ের), জনাব আমজাদ আলী খন্দকার, জনাব জি. জেড. এম. এ. মবিন, জনাব এম. এ. রউফ ও জনাব এস. এম. বাবু - এর সাহসী ভূমিকার কারণে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণের অডিও-ভিডিও কভারেজ করা সম্ভব হয়! বর্তমানে বঙবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণসহ যে সকল লাইভ ভাষণ ও ছবি রয়েছে - তার প্রায় সবগুলোই ডিএফপির ধারণকৃত।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই শাখার (তদানীন্তন চলচ্চিত্র বিভাগ বা ফিল্ম ডিভিশন) অফিস ছিল সচিবালয়ের টিনশেড ভবনে। ২৫শে মার্চের কালরাতের পর চলচ্চিত্র বিভাগের তৎকালীন পরিচালক/ কন্ট্রোলার জনাব মহিবুর রহমান খায়ের আশংকা করছিলেন যে, পাক হানাদার বাহিনী ৭ই মার্চের ভাষণটি নষ্ট করতে পারে। তাই ভাষণের মূলকপি ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে তিনি সহকারি চিত্রগ্রাহক জনাব আমজাদ আলী খন্দকারকে নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে জনাব আমজাদ আলী খন্দকার ৯ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ভাষণের অডিও-ভিডিও ফুটেজসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট একটি ৪২ইঞ্চি স্টীলের ট্রাংকে ঢুকিয়ে একটি বেবিট্যাক্সিতে করে সোয়ারি ঘাটে নিয়ে যান। পাক হানাদার বাহিনীর কড়া টহলের মধ্যে জনাব আমজাদ বুড়িগঞ্জা নদীর অপর পাড়ে জিঞ্জিরা হয়ে মুন্সিগঞ্জের জয়পাড়া মজিদ দারোগা বাড়ীতে ভাষণটি নিয়ে যান। তাঁর পেছনে পেছনে জনাব মহিবুর রহমান খায়েরও সেখানে যান। সেখানে অত্যন্ত গোপনে ভাষণটি সংরক্ষণ করা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর সেখান থেকে এনে পুনরায় তা অফিসের স্টোরে সংরক্ষণ করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের পরও ষড়যন্ত্রকারীরা ভাষণের রীলটি নষ্ট করার লক্ষ্যে চলচ্চিত্র বিভাগে তল্লাশি চালায়। কিন্তু চলচ্চিত্র শাখার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণ ভাষণের মূল পিকচার নেগেটিভ ও সাউন্ড নেগেটিভ অন্য একটি ফুটেজের ক্যানে ঢুকিয়ে ডিএফপির ফিল্ম লাইব্রেরিতে লুকিয়ে রাখে। এভাবেই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ কভারেজের স্মৃতিবাহী শব্দধারণ যন্ত্র বা নাগ্রা মেশিন এবং 35mm ARRI ক্যামেরাটি এখনো ডিএফপিতে সংরক্ষিত আছে।

এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের অডিও-ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণে এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবার সরকার গঠন করলে ডিএফপির চলচ্চিত্র শাখা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর প্রায় দেড় লক্ষ ফুট ফুটেজ ভারতের মাদ্রাজের প্রসাদ ল্যাব থেকে ডেভেলপ করে এবং ভিডিও ফরম্যাটে ট্রান্সফার করে এনে বিটিভিসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের জন্য সরবরাহ করে। এসব ফুটেজ ব্যবহার করে ডিএফপি থেকে চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু, আমাদের বঙবন্ধু, অসমাপ্ত মহাকাব্য, বাংলার মাটি বাংলার জল, জাতির পিতা জবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতা, যুদ্ধদিনের বন্ধুরা, হৃদয়ে একুশ সহ বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে এসব ফুটেজ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সরবরাহ করা হয়েছে। ডিএফপির এ প্রচেষ্টার কারণে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের লাইভ ফুটেজ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

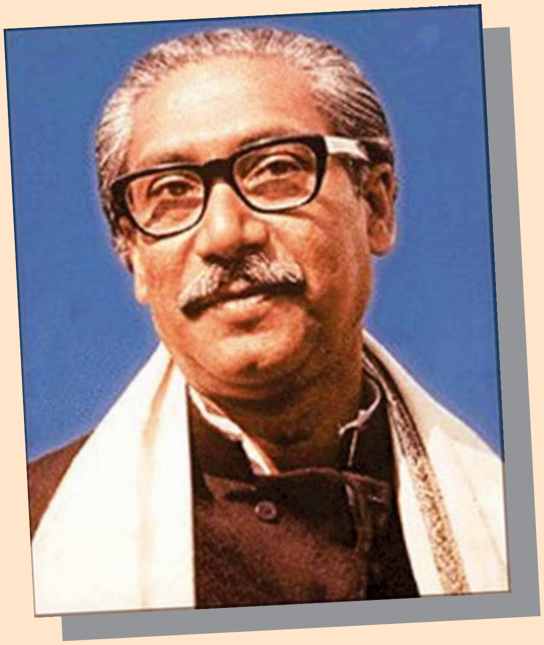

বিজয়ের ৪৬ বছর

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শ্রেষ্ঠ অর্জন

খালেক বিন জয়েনউদদীন

ষোলো ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের এই দিনে আমরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দখলদার পাকিস্তানি সৈন্য ও এদেশীয় দালালদের পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেছিলাম। দেখতে দেখতে ৪৬ বছর হয়ে গেল। আর ৪ বছর হলে অর্ধশত বছর হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা যারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিজয়ের পরম প্রাপ্তিতে গৌরব অনুভব করছি। এ বিজয় ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া। এ বিজয় ২ লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত। সর্বোপরি বাঙালির ২ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ফসল। তাঁর দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আপোশহীন সংগ্রামী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সৃষ্টির কারণে আমরা বলি, বাংলাদেশের অপর নাম শেখ মুজিব।

আমরা এ বছর ৪৬তম বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করব। বলা যায়, প্রায় অর্ধশত বছর। আপনি যদি আমার বয়সি হন, তাহলে প্রশ্ন করব– একাত্তরের বিশ বছরের যুবক আপনি। এখন সত্তরের কাছাকাছি। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে আপনি কেমন আছেন? বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট বাংলাদেশ আপনাকে কী দিয়েছে? বিজয়ের ৪৬ বছরে আপনার অর্জন কী? একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আপনাকে কী দিয়েছে?

উত্তরে আপনি প্রথমেই বলবেন– বঙ্গবন্ধু আমাদের বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। আমরা খেয়ে-পরে ভালো আছি। প্রিয় কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর স্বপ্ন সফল করেছেন। এটাই আমাদের বড়ো প্রাপ্তি। তবে ইতিহাস সাক্ষী– এজন্য তাঁকে কৈশোর থেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সংগ্রাম ও আন্দোলন করতে হয়েছে এবং জীবনের শেষবিন্দু রক্ত দিয়ে তাঁর প্রতিদান দিতে হয়েছে। বিজয়ের ৪৬ বছর এবং তাঁর জীবিতকালের ৫৫ বছরই বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের প্রকৃত ইতিহাস। '৪৭-এর স্বাধীনতা আমাদের মোহভঙ্গ করে। পাকিস্তানের এ অংশের বাঙালিদের ওপর প্রথমেই ভাষার প্রশ্নে আঘাত করে। মায়ের অধিকার কেড়ে নিতে গুলি চালায়। বাংলা মায়ের সন্তান সেই বায়ান্নে প্রথমে রক্ত দেয়। তারপর শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু। বাঙালিকে কখনো পাকিস্তানিরা ক্ষমতায় বসতে দেয়নি। যার শুরু অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে প্রবেশ করতে না দিয়ে উর্দুভাষী খাজা নাজিমুদ্দিনকে ছলে-বলে-কৌশলে এ অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করা। তখন শেখ মুজিব পূর্ণ যুবক। দ্বিজাতিতত্ত্বের স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হলে পূর্ব বাংলার মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। তারা অধিকার আদায়ে সোচ্চার হন। আর এদের নিয়েই ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এক পর্যায়ে আওয়ামী (মুসলিম) লীগের নেতৃত্ব বর্তায় শেখ মুজিবের ওপর। তিনি ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত দলের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত দলের সভাপতি তথা দলের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলায় গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। এই গণজাগরণে তাঁর ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন, এবং একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। মার্চের ৭ তারিখ তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন এবং সমগ্র বাঙালি জাতিকে নির্দেশনা দিলেন। অবশেষে এল মাহেন্দ্রক্ষণ। পাকিস্তানি সৈন্যের বাঙালির ওপর আক্রমণের সাথে সাথে সেই ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২টার পরে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তাঁর ঘোষণা ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং চট্টগ্রাম বেতারেও তা বার বার প্রচারিত হলো। এই ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে তাঁকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর নিজস্ব বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হলো পাকিস্তানে। আর এদিকে তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে স্বাধীনতাকামী বাংলার জনগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রথমে পাক সৈন্যদের প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ালো এবং ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে সরকারের সশস্ত্রবাহিনী (মুক্তিবাহিনী) তে যোগ দিয়ে যুদ্ধ শুরু করল।

একাত্তরের সেই মুক্তিবাহিনীর মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল পুরো নয় মাস। অবশেষে ৩০ লক্ষ প্রাণের ক্ষয় ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম বিনষ্টের বিনিময়ে যুদ্ধের বিজয় ঘটে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ। এদিন ঢাকার রমনা রেসকোর্সে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে পাকি জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন। এভাবেই একাত্তরের মহাযুদ্ধের বিজয় সূচিত হয়। একাত্তরের এই যুদ্ধে আমাদের আশ্রয়, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে ভারত। পাশে দাঁড়ায় রাশিয়া, পোল্যান্ডসহ ইউরোপের অনেক দেশ। আর বিপক্ষে সরাসরি পাকি সৈন্যদের সাহায্য

করে পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফেরেন ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি এবং সাথে সাথে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নতুন করে দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও মানুষের সমন্বয়ে একটি প্লাটফর্ম গঠন করে দেশ উন্নয়নের কর্মসূচি ঘোষণা দেন। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীরা দেশি-বিদেশিদের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট তাঁকে আত্মীয়স্বজনদের সাথে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করে। খুনি ও খুনিদের দোসররা ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারা অবৈধভাবে ২১ বছর দেশ চালায় ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। এরপর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনতে কর্মকাণ্ড শুরু করে। এখন আমরা বলতে পারি '৭৫ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত ২১ বছর কালো সময়কে বাদ দিয়ে বাকি বছরগুলোয় আমরা কী অর্জন করেছি? বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়, এদেশের মানুষ কেমন আছে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন কি সফল হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু সরকারের অর্জনগুলোর কথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলের অর্জনগুলো হলো:

- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন
- মিত্র সৈন্যদের স্বদেশে প্রেরণ
- ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন
- প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিককরণ ও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ
- মদ, জুয়া ও ঘোড়ার রেস নিষিদ্ধ ঘোষণা
- কলকারখানা সরকারের আওতায় আনা ও প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ
- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় আনা
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ও শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা
- তাবলিগ-জামাতকে জমি প্রদান
- পাক সৈন্য কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরের রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ
- পাকিস্তানে বন্দি বাঙালিদের ফিরিয়ে আনা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান, সনদ ও ভাতা প্রদান করা এবং কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন
- কৃষকদের উন্নয়নের জন্য সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি ঘোষণা।

পঁচাত্তরের পর এসব অর্জনগুলো অবৈধ শাসকরা বিনষ্ট করে। রক্তে ধোয়া সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্তম্ভগুলো বুড়িগঙ্গায় ফেলে দেয়। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের রেহাই দিয়ে বিদেশে পাঠায় আর নির্মমভাবে জাতীয় নেতাদের জেলখানায় হত্যা করে। থমকে যায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সে এক কালো অধ্যায়। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি আদলে বাংলাদেশ। '৮১-তে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এক সাগর পাথর বুকে চেপে ফিরে আসেন স্বদেশে। নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়ান এবং ভোট ও ভাতের অধিকারে নিরন্তর সংগ্রাম করেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের। সেই সংগ্রামের কাহিনি কারো অজানা নয়। বার বার তাঁকে মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সকল বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে জনগণের রায়ে ক্ষমতায় আসীন হন এবং ২১ বছরের জঞ্জাল দূর করতে ব্রতী হন। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম পর্বে তিনি সার্বিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ সময় দারিদ্র্য বিমোচন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য উৎপাদন, আশ্রয়ণ, বয়স্ক ভাতা, বিধবাভাতা, গৃহায়ন, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন করেন। আর এ সময়ের শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলো হলো :

- সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের চার স্তম্ভ পুনঃস্থাপন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধ
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে শান্তিচুক্তি সম্পাদন
- শিখা চিরন্তন, স্বাধীনতা স্তম্ভ ও স্বাধীনতা জাদুঘর প্রতিষ্ঠা
- বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার কার্যক্রম শুরু
- বঙ্গবন্ধু সেতুর কাজ সমাপ্তিকরণ
- ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদি পানিচুক্তি সম্পাদন
- কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা ও বিনামূল্যে প্রাথমিক স্তরের বই বিতরণ
- মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনে জাতিসংঘের স্বীকৃতি এবং ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন
- মাধ্যমিক স্তরে বিনা বেতনে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ
- বিনা জামানতে বর্গাচাষিদের ঋণ প্রদান।

২০০৯ সালে তিনি আবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পূর্বের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় জীবনের অনেক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

দৃঢ় প্রত্যয় ও দৃপ্ত শপথে জাতীয় স্মৃতিসৌধে সর্বসাধারণের বিজয় উদ্‌যাপন

- বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার কাজ আংশিক সম্পন্ন করা
- মানবতাবিরোধীদের বিচার কাজ শুরু
- ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমানার নিষ্পত্তি
- জাতিসংঘ কর্তৃক শেখ হাসিনার 'শান্তি মডেল' প্রাপ্তি
- বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি
- প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন
- কৃষি কার্ড ও ১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক হিসাব খোলা
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন
- সকল প্রকার নির্ধারিত ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সেনা সদস্যদের অংশগ্রহণ ও সুনাম অর্জন
- জাতিসংঘের বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন পুরস্কার লাভ
- দারিদ্র্যের হার ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ২৪.৩ শতাংশে কমিয়ে আনা
- সমগ্র বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- সমগ্র বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর।

১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ

এসব অর্জনগুলো আরো দৃশ্যমান হয় বর্তমান সরকারের ২০১৪ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর। প্রায় ৪ বছর হলো এই সরকার সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আমাদের অর্জনের ভাণ্ডারে যে সাফল্যগুলো জমা পড়েছে তাহলো:

- বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ
- মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি কার্যকর হওয়ায় ছিটমহল সমস্যা সমাধান
- মাথাপিছু আয় ১,৩১৪ ডলারে উন্নীত
- দারিদ্র্য হ্রাস ২২.৪ শতাংশে আনা
- ২৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (আগস্ট ২০১৬)
- নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু
- মেট্রোরেল ও এলিভেট এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজ শুরু
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৪,০৭৭ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান
- শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন
- জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণকে বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি। এমওডব্লিউতে এখন ৪২৭টি প্রামাণ্য সংগ্রহের অন্যতম বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। এটি সমগ্র বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন।

আমাদের এসব অর্জনের মূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সমূহ প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার একমাত্র কাণ্ডারি বঙ্গবন্ধুর দুহিতা শেখ হাসিনা। তিনি পিতার যোগ্য উত্তরসূরি। প্রখ্যাত কথাশিল্পী শওকত ওসমান একটি রচনায় লিখেছেন : ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের এক সকালে শেখ হাসিনা দেখলেন, তাঁর মৃত্যুভয়হীন প্রাণের অধিকারী পিতামাতা, তিন ভ্রাতা ও বহু নিকট আত্মীয়স্বজন আন্তর্জাতিক ও দেশি আততায়ীর নৃশংস ষড়যন্ত্রে মৃত্যুমুখে পতিত। মুঠিমধ্যে ধৃত নিজ কলিজাসহ শেখ হাসিনা এগিয়ে এলেন জনকের অসমাপ্ত সোনার বাংলা গড়ার ব্রত সম্পাদনে। গৃহবধূ থেকে এসে দাঁড়ালেন রাজনীতির প্রাঙ্গণে, যেন মা ফজিলাতুন নেছার অবিকল প্রতিমা।

সোনার বাংলা গড়ার অভিযাত্রায় তাঁর সঙ্গী এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ। যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নই তাঁর স্বপ্ন। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বপ্ন। আমাদের সেই স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিল '৭৫-এর খুনিরা এবং তাদের দোসর ও পরামর্শকেরা। তারা একুশ বছর অবৈধভাবে দেশটিকে গ্রাস করে রেখেছিল। অনিয়ম, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের সেই কাল। দেশের সাধারণ মানুষ অভাব-অনটনে ছিল জর্জরিত। আর এখন খাদ্য উৎপাদন ও জনশক্তিতে বলীয়ান বাংলাদেশ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও নিরাপত্তা বিধানে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। আমাদের উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলো বর্তমান সরকারের আমলেই সফলতা বয়ে এনেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের কথা প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামাও বলেছিলেন। সোজা কথা, দেশের মানুষ দুমুঠো অন্ন খেয়ে নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করছে। উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার অভিযাত্রায় একমাত্র কাণ্ডারি শেখ হাসিনা। আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনার বদৌলতে পাওয়া। সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশে এক নন্দিত জননী এবং তাঁর দীঘল আঁচলের মমতায় ঢাকা সমগ্র বাংলাদেশ। বিশ্বের মানচিত্রে এখন বাংলাদেশের অবস্থান দৃঢ়। ৪৬ বছরের বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিফলে যায়নি। বাংলাদেশের অর্জনগুলো ইতিহাস সৃষ্টি করছে।

লেখক: সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ মার্চের ভাষণের ইউনেস্কোর স্বীকৃতি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে সর্বমহলের সাথে শরিক হন

৭ মার্চের ভাষণের ইউনেস্কোর স্বীকৃতি উদ্‌যাপন

রেহানা শাহনাজ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় ২৫ নভেম্বর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্ব মহলের জনগণ আনন্দ শোভাযাত্রা শেষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশে যোগ দেন। বিভাগীয় শহরসহ সারা দেশে সরকারি উদ্যোগে এ আনন্দ শোভাযাত্রা হয়েছে।

২৫ নভেম্বরের দুপুরটা ছিল অন্যরকম। সূর্যতাপ ছিল সহনীয়, বাতাসে ছিল শীতের আমেজ। সব রাজপথ যেন মিশে গেছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর থেকে। সকাল থেকেই মাথায় লাল-সবুজের পতাকা, হাতে রংবেরঙের ফেস্টুন, ব্যানার নিয়ে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে খণ্ড মিছিল নিয়ে হাজারো মানুষ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের জাদুঘরে সমবেত হতে থাকে। সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে, হাতির পিঠে চড়ে, আবার খোলা সজ্জিত ট্রাকে ও পায়ে হেঁটে দলে দলে জনগণ আনন্দ মিছিলে শামিল হয়।

৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় গণমানুষের যে আনন্দ-উল্লাস তা প্রত্যক্ষ না করলে উপলব্ধি করা যাবে না, স্বতঃস্ফূর্ত উদ্‌যাপন বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের হৃদয়ের খুব কাছের একজন। সেদিনের সর্ব মহলের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ শোভাযাত্রা আবারো তা প্রমাণ করল। দুপুর ১২টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন শুরু হয়। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর দুপুর সোয়া ১২টায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে থেকে শোভাযাত্রা বের হয়। সামনে সুসজ্জিত হাতি ও ঘোড়ার গাড়ির পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের সজ্জিত খোলা গাড়িতে করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রার আয়োজক ছিল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। শোভাযাত্রা শেষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ হয়। সমাবেশে সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তারা ছাড়াও অংশ নেন বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী। সমাবেশে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। একদিকে শাহবাগ ও অন্যদিকে দোয়েল চত্বরে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। যারা ৭ মার্চের ভাষণ শোনেনি, আসতে পারেনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁরা সেদিনের অনুভূতি উপলব্ধি করেছে ২৫ নভেম্বরের এই জনসমুদ্র দেখে। হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন জরুরি সেবা সংস্থার কর্মচারী ও কর্মকর্তারা সমাবেশে অংশ নেন। সমাবেশে বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্ররাও অংশ নেয়।

বিআরটিসি'র দোতলা বাস সহ। মিনিবাস, পিকআপ ভ্যানে করে স্লোগান দিয়ে অনেক সংগঠন সমাবেশে যোগ দেয়। ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার হাতে শত শত র‍্যালি সমাবেশস্থলে পৌঁছতে বেশ সময় নেয়। এত জনসমুদ্রের মাঝে অনেক যানবাহন থেকে মাইকে বাজানো হয় বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নানা গান। বেলা ১১টা থেকে রাজধানীর সচিবালয়, পুরানা পল্টন, তোপখানা রোড, শাহবাগ প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হতে থাকে সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তারা। ব্যানার, ফেস্টুন হাতে ঢাকঢোল বাজিয়ে তাদের উল্লাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুর ২টা ৫৫ মিনিটে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশস্থলে পৌঁছেন। ঠিক ৩ টায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে

শুরু হয় সমাবেশের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। ২২ মিনিটের বক্তব্যের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ৭ মার্চের দিনটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে বলেন, তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে থাকার। তিনি সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এসেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনেছিলেন।

স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি আবারো ক্ষমতায় আসা ঠেকাতে জনগণকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, রাজাকার, আলবদর, যুদ্ধাপরাধী, খুনি, দুর্নীতিবাজ ও ইতিহাস বিকৃতকারীরা আর যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় ইতিহাসের সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, পঁচাত্তরের পরে যারাই ক্ষমতায় এসেছিল, তারাই এই ভাষণ নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু ইতিহাসকে কেউ মুছে ফেলতে পারে না। ইতিহাস সত্য, ইতিহাস চির ভাস্বর। এ ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সেটাই প্রমাণ করেছে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর ৭ মার্চের ভাষণকে নিষিদ্ধ করা হয়। রেডিও-টেলিভিশনে এ ভাষণ প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। এ ভাষণ বাজাতে বাধা এসেছে। কত মানুষ জীবন দিয়েছে ভাষণ বাজানোর কারণে। প্রচার করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের বহু নেতা, কর্মীকে নির্যাতিত হতে হয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারেনি। তিনি বলেন, যারা এ ভাষণ নিষিদ্ধ করেছিল, যারা ইতিহাস বিকৃত করেছিল, আজ তাদের অবস্থা কী? তারা এখন কোথায় মুখ লুকাবে?

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ইউনেস্কোর স্বীকৃতি উদ্‌যাপনে ডিএফপি'র আনন্দ শোভাযাত্রা

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এর অবিস্মরণীয় অবদান তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, এ ভাষণ ইতিহাসের গৌরবগাথা। এটি কেবল একটি ভাষণ নয়। সেখানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার দিক নির্দেশনাও দিয়ে গেছেন। এ ভাষণের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক মুক্তির পথে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। আগামীর বাংলাদেশ হবে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ, যা ৭ মার্চের ভাষণেই বলা হয়েছে।

৭ মার্চের ভাষণ বিশ্লেষণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বহু নেতা ও রাষ্ট্রনায়কের ভাষণ ছিল লিখিত। কিন্তু এই একটি মাত্র ভাষণ ছিল অলিখিত। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে স্বাধীনতার দিক -নির্দেশনা দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলেছিলেন, গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এত দূরদর্শিতা ও এত দিক-নির্দেশনা বিশ্বের আর কোনো ভাষণে পাওয়া যায় না। মূলত এ ভাষণের মধ্য দিয়েই জাতির পিতা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ দিয়েছেন। সমবেত শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে জানতে হবে, বুঝতে হবে অনুধাবন করতে হবে। এ ভাষণেই বলা আছে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ কেমন হবে।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং জাতির পিতার অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব তুলে ধরে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক মুক্তির পথে হাঁটা শুরু করেছিলেন। দেশ যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, তখনই স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করা হয়। পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে কেবল হত্যাই করা হয়নি, যে আদর্শ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ও লাখো শহিদ রক্ত দিয়েছিল সে আদর্শ ভূলুণ্ঠিত করে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আলবদর ও খুনিদের ক্ষমতায় বসানো হয়। তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে ইতিহাস বিকৃত করে।

স্বাগত বক্তব্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আজম বলেন– বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের কালোত্তীর্ণ ভাষণটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ন্যায় ও সত্যের পথে উদ্দীপ্ত করে। এ ভাষণ স্বাধীনতাকামী মানুষ ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগাবে –এটিই সবার প্রত্যাশা। সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এ ভাষণ রাজনীতির শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। গোটা বাঙালি জাতির কণ্ঠস্বর ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যে সময়টিতে ভাষণ দিয়েছিলেন, ঠিক সেসময় অর্থাৎ বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণটি প্রচার করা হয়। পরে লিয়াকত আলী লাকির নির্দেশনায় শিশু-কিশোররা পরিবেশন করে 'ধন্য মুজিব ধন্য' শীর্ষক নৃত্যগীতি। ৭ মার্চের ভাষণের ওপর নির্মলেন্দু গুণ রচিত 'স্বাধীনতা' এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়।

শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের পরিবেশনায় নৃত্যগীতি ও কোলাজ পরিবেশিত হয়। এ সময় শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়। শামীম আরা নীপা ও শিবলী মোহাম্মদের নির্দেশনায় সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়। কবি কামাল চৌধুরীর কবিতা 'মার্চ' আবৃত্তি করেন আবৃত্তিকার আহকামউল্লা। লেজার শো ও আতশবাজির মাধ্যমে শেষ হয় বর্ণাঢ্য এ আয়োজন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নাট্যাভিনেত্রী শমী কায়সার ও আবৃত্তিকার হাসান আরিফ।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শামসুজ্জামান খান

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এক নবদিগন্ত উন্মোচনকারী ঘটনা। আমাদের এই উপমহাদেশ দীর্ঘদিন ছিল পরাধীন। ফলে এই অঞ্চলে সামাজিক জাগরণ এবং শিক্ষাদীক্ষার তেমন প্রসার ঘটেনি। পূর্ব বাংলার অবস্থা ছিল আরো করুণ। কারণ ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজধানী কলকাতার পশ্চাৎভূমি হিসেবে এই অঞ্চল ছিল আরো পশ্চাৎপদ। তবে এ অবস্থার মধ্যেও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা অঞ্চলে যেসব কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে তাতে জাগৃতির উপাদান সঞ্চিত হচ্ছিল। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলার বাঙালির জাতিসত্তা গঠন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আকস্মিক ছেদ পড়লেও ১৯৪০-এর দশক থেকেই তা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকারের সংগ্রাম এবং সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা ধীরে ধীরে গভীরতা অর্জন করে। এই ধারাটি ১৯৬০-এর দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হয়। এরই ধারাবাহিক পরিণতি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার নবজাগ্রত বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়। এই ঘটনাকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে নবদিগন্ত উন্মোচনকারী বলে আখ্যায়িত করেছি। মাত্র কয়েকটি লাইনে আমরা দীর্ঘ সময়কালের ইতিহাসের একটি অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেছি। এর প্রতি স্তরে অসংখ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাপ্রবাহ এবং তার অভিঘাতে সৃষ্ট নানা পরিস্থিতির মোকাবিলা করে বাঙালি শেষ পর্যন্ত তাদের অশেষ সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রটি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বাঙালির দুই-আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে অটুট ঐক্যবদ্ধ হয়ে এমন ঘটনা সৃষ্টির আর কোনো নজির নেই। এক্ষেত্রে এই অঞ্চলের নির্যাতিত-নিপীড়িত দুঃখী মানুষের জীবনপণ সংগ্রাম এবং বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশমেটিক নেতৃত্বেরও আর কোনো তুলনা আমাদের ইতিহাসে নেই।

আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ মাত্র ৯ মাসে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই ৯ মাসকে সৃষ্টি করেছে আরো কত দিন, কত মাস তার খুঁটিনাটি তথ্য এখনো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে শুরু হলেও এর পটভূমিগত একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের এই পটভূমিকার সূচনাবিন্দু কখন– ইতিহাসবিদদের মধ্যে কেউ কেউ তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ১৭৫৭ সাল থেকেই এই সময়কাল নির্ধারণ করতে চান। কেউ কেউ মনে করেন– না, অত পেছনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ১৯০৫ সাল থেকে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, সেখান থেকেই বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়েছে বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকই ১৯৪৮-১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন থেকেই আমাদের মুক্তিসংগ্রামের শুরু বলে মনে করেন। তারা বলেন, এর আগে আর কখনো বাঙালি জাতিসত্তা এতটা তৃণমূলস্পর্শী এবং সর্বব্যাপক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমরা এই মতের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকে আর একটু পেছনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি। আমাদের মতে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সূচনা পর্ব হিসেবে ১৯২০-এর দশককে নির্ধারণ করাই যথাযথ। আমাদের এই মতের পক্ষে যুক্তি হলো, ১৯২০-এর দশক বাংলার ইতিহাসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশের জন্য এই দশক অনন্য। কারণ এর আগে ১৯০৫ সালে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত তাতে নেতৃত্ব ও আধিপত্য সবটাই ছিল উচ্চশিক্ষিত নগরবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের। বাঙালি মুসলমান এই আন্দোলনে তেমন অংশগ্রহণ করেনি। ফলে ইংরেজ আমলে সৃষ্ট বাংলার অসম বিকাশের (uneven development) কারণে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান একই জাতীয় চেতনা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। নগর সমাজের ওপরের স্তরে শুধু হিন্দু ভদ্র লোকশ্রেণির মধ্যেই বাঙালি জাতীয়তার চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪) পর বাঙালির বিশেষ করে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মূল্যবোধগত একটি পরিবর্তন দেখা দেয়। নগদ অর্থের অভাবে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে পূর্ব বাংলার কৃষিজীবী মুসলমানদের মধ্য থেকে আর্থিকভাবে সচ্ছল কিছু

'৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে গ্রামের সাধারণ যুবকদের অস্ত্র ও যুদ্ধ কৌশল প্রশিক্ষণ

মানুষ নানাভাবে যুদ্ধজনিত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এরফলে ধীরে ধীরে গ্রামীণ বাংলাদেশের কৃষক সমাজের মধ্য থেকে নতুন একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই তৈরি হতে থাকে আগামী দিনের নব আলোকবার্তাবাহীরা। এরাই ধীরে ধীরে গ্রামে এবং শহরে-বন্দরে তাদের অবস্থান সৃষ্টি করে নিতেও সক্ষম হয়। এমনকি স্থানীয় সরকার নির্বাচনসহ রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মেও তাদের আনাগোনা শুরু হয়। এরফলে বাংলার রাজনীতিতেও একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম নবাব নাইটদের জায়গায় কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা আইনজীবী বা অন্য পেশার মুসলমানেরাই রাজনীতিতে বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক চুক্তি মুসলিম মধ্যবিত্তকে বিকাশের একটা পরিসর দেয়। এর প্রভাব ব্যাপক বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও পড়তে শুরু করে। পরে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বও নিজ হাতে রাখেন। এতে দ্রুত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটি আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশের দশক থেকে ত্রিশের দশকের এই ঘটনা বাংলার রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে।

এছাড়াও ১৯২০-এর দশকে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এক যুগ পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই প্রথম বাঙালি মুসলমান ব্যাপকভাবে বাঙালি জাতিসত্তা গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর আগে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম উপাদান খুব নগণ্যমাত্রায় ছিল বলে বাঙালি মুসলমান এতে কোনো আগ্রহ বোধ করেনি। কিন্তু নজরুল বাংলা সাহিত্যে বিপুল মুসলিম উপাদান এবং সেই সাথে সাথে হিন্দু ও বিশ্বপুরাণ এবং ঐতিহ্যের নিপুণ প্রয়োগ ঘটানোয় ব্যাপক বাঙালি মুসলমান বাঙালিত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এতে হিন্দু ও মুসলিম বাঙালির মধ্যে যে অসম অর্থনৈতিক বিকাশজনিত পার্থক্য ও বৈষম্য ছিল তা কিছু পরিমাণে হ্রাস পায় এবং নজরুল হয়ে ওঠেন বাঙালির জাতীয় কবি। নজরুলের আবির্ভাবের এই চেতনা বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে গভীরতর মাত্রা যোগ করেছে। অতএব নজরুলের ঐতিহাসিক আবির্ভাবকালের এই সামাজিক জাগরণ, অপূর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পূর্ণতা দানের প্রয়াস এবং অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনমূলক সাহিত্যকে বাদ দিলে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এমনকি আন্তর্জাতিক মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসও কঠিন হয়ে পড়ত। নজরুল বলেছিলেন, বাংলা বাঙালির হোক, বাংলার জয় হোক। নজরুলের 'ভাঙার গান' ও (১৯২২), 'পূর্ণ অভিনন্দন' শীর্ষক কবিতায় 'জয় বাংলা' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। এই 'জয় বাংলা'ই ছিল মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির এক বিরাট শক্তিশালী অস্ত্র। এসব ঘটনাকে বাদ দিলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে বোঝা কি সম্ভব? এছাড়া ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টির প্রগতিশীল ভূমিকাও যে নতুন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজে নব চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেনি এই কথাও তো বলা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯২৬ সালে ঢাকায় যে মুসলিম সাহিত্যসমাজ গড়ে ওঠে বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক ও যুক্তিবাদী রাষ্ট্র গঠনে তার ভূমিকাও গুরুত্ব বহন করে। অতএব ১৯২০-এর দশক বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যে অসাধারণ পটভূমিকায় ভূমিকা পালন করেছে তা বাদ দিলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

এবার আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার বিষয় নির্বাচন এবং সমস্যা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস রচনার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি চ্যালেঞ্জও বটে। প্রথম কথা হলো, বাংলার ঐতিহাসিকেরা এতটা বিশাল এবং সম্পূর্ণ নতুন ঘটনাসম্পন্ন ইতিহাস রচনা এর আগে করেননি। এই ইতিহাস রচনার পদ্ধতি কি হবে সে ব্যাপারেও কোনো প্রখ্যাত পণ্ডিত এখন পর্যন্ত কোনো গ্রহণযোগ্য দিক-নির্দেশনা দেননি। অতএব এই ইতিহাস রচনায় কী প্যারাডাইম ব্যবহৃত হবে সে প্রশ্নও আছে। প্রচলিত প্যারাইডাইমশিফট তো হতেই হবে। কিন্তু সেটা কোন ধরনের? এই ইতিহাস যথাযথভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে লিখতে হলে এবং এর অনন্য স্রষ্টা কৃষক-সন্তান ও ব্রাত্যজনের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে হলে ফিল্ডওয়ার্ক পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। ইতিহাসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষকেরা এ ধরনের কাজও আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত করেননি। সাধারণ মানুষের বীরত্ব, সাহসিকতা এবং জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করার অনন্য শৌর্যকে তুলে ধরতে হলে মাঠ পর্যায়ে বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান অতি জরুরি। সেই কাজ ঐতিহাসিকেরা যে করবেন সে রকম প্রশিক্ষণও তো আমাদের ঐতিহাসিকদের নেই।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ইতিহাস রচনার জন্য নানা বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কেউ বলছেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস লেখাই যথাযথ হবে। অনেকেই এই পদ্ধতিকে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন না। তারা বলেন, এভাবে ইতিহাস লিখলে তাতে শুধু সামরিক বাহিনীর গুরুত্বই প্রাধান্য পাবে। তারা বলছেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন ২১টি জেলাকে ধরেই তৃণমূল পর্যায়ে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং তার প্রামাণিককরণের ভিত্তিতেই ইতিহাস লেখা সমীচীন। এতে ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনায়ও একটি নতুন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক ইতিহাস তো হতেই হবে। তাছাড়াও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকার কারণে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকা সত্ত্বেও তিনি যে বাস্তবের প্রমাণ সাইজের মানুষের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছিলেন এবং হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার এক অসাধারণ প্রতীক তাকেও যথাযথ মাত্রায় ধারণ করতে হবে। যুদ্ধ হয়েছে বহু স্তরে এবং বহু স্থানে। যুদ্ধ কোথাও সরাসরি, কোথাও পরোক্ষ, কোথাও গেরিলা পদ্ধতিতে। এসব বিষয়গুলোকেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে আনতে হবে। এই যুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা, ভারত সরকারের ভূমিকা, শরণার্থী সমস্যা, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতা বাংলাদেশে অবরুদ্ধ মানুষ পাকিস্তানে আটকে পড়া সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিরা, প্রবাসী বাঙালিদের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পুলিশ, ইপিআর, নৌকমান্ডো এবং নারীদের অবদানও চিহ্নিত করতে হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যে জনযুদ্ধ ছিল এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। গ্রামবাংলার কৃষক-ক্ষেতমজুর এবং ব্রাত্যজনের ভূমিকাই ছিল প্রধান। এদের অসংখ্য বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাকেও তুলে ধরতে হবে। আমরা আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধকে ব্রাত্যজনের এবং সাধারণ মানুষের যুদ্ধ বলে আখ্যাত করি। কিন্তু এই যুদ্ধে সেনাবাহিনীর বাইরের কোনো সাধারণ মানুষ বা ব্রাত্যজন কেন বীরশ্রেষ্ঠ হতে পারলেন না? ঐতিহাসিকদের কাছে মানুষ সে প্রশ্নেরও জবাব প্রত্যাশা করে। অতএব মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করতে হবে বহুমুখী দৃষ্টিকোণে এবং বহুমাত্রিক অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে।

লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ থেকে প্রায় ৪৬ বছর পূর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। যোগাযোগ বিষয়ে আধুনিক নিয়মকানুনের এক আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণে।

প্রতি মিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এই কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন। সম্প্রচার তত্ত্বে প্রতি মিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ একটি আদর্শ হিসাব। এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই, কোনো বাহুল্য নেই– আছে শুধু সারকথা, সারমর্ম। তবে দু-একটি স্থানে পুনরাবৃত্তি বক্তব্যের অন্তর্লীন তাৎপর্যকে বেগবান করেছে।

ভাষণের সূচনাপর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে– 'There is nothing like good beginning for a speech'. বক্তব্যের প্রারম্ভে শ্রোতার মানসিক অবস্থান (audience orientation) ও সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক বলে যোগাযোগ তত্ত্বে যা বলা হয়, (reference to audience and reference to recent happenings) তার আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটে বঙ্গবন্ধুর এই যুগান্তকারী ভাষণে।

বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন, ‘ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।’ অত্যন্ত কার্যকর বক্তৃতার অবতরণিকা– যা পুরো বক্তৃতার মূল ভিত্তি তৈরি করেছে ও শ্রোতৃকুলকে অভ্যুদিত বক্তৃতার আভাস দিচ্ছে।

পুরো বক্তৃতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বক্তৃতাটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় বার্তা ও তার স্বাভাবিক অনুযাত্রায় পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রকাঠামোর পূর্বাঞ্চলের পরিসমাপ্তির প্রজ্ঞপ্তি ও বিবরণী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূল সূত্র ৭ মার্চের এই বক্তৃতা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এ বক্তৃতা ছিল আমাদের সিংহনাদ বা যুদ্ধ স্লোগান। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ–সকলের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত এই বক্তৃতা শ্রবণে। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে উচ্চারিত এই বক্তৃতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেনি, তাদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কারণ, এ ভাষণই ছিল কার্যত (de facto) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা।

জনযোগাযোগে যেসব speech idiom ব্যবহার করার কথা তা অত্যন্ত সঠিকভাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে এই বক্তৃতায়। বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার বাংলার জনগণের সাথে সংলাপ এই বক্তৃতা। প্রাঞ্জল কথোপকথনের ভঙ্গিমায় অতি সহজ–সাবলীল ভাষায় তাৎক্ষণিক রচিত এই ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার মূল দলিল। শ্রোতাকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে তিনি সংলাপের বাচনশৈলী অনুসরণ করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সরাসরি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পাঁচটি। ‘কি অন্যায় করেছিলাম? কি পেলাম আমরা? কিসের আর-টি-সি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব’? বক্তার সাথে শ্রোতার মেলবন্ধন সৃষ্টিতে 'ask question and then answer' পরামর্শের সুপ্রয়োগ ঘটেছে এ ভাষণে। পুরো ভাষণে বর্তমানকালের যৌক্তিক ব্যবহার বক্তৃতাটিকে সজীবতা দিয়েছে। আবার কথোপকথনের ধারার স্বার্থে তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সুন্দর সংমিশ্রণও ঘটিয়েছেন এই বক্তৃতায়।

বক্তৃতার যেসব অংশে বঙ্গবন্ধু আদেশ, নির্দেশ বা সতর্ক সংকেত

দিচ্ছেন, সেসব স্থানে বাক্যগুলো স্বাভাবিকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। বহু গবেষণার পর যোগাযোগ তাত্ত্বিকদের declarative বাক্য সংক্ষিপ্ত করার বর্তমান নির্দেশিকা বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যথাযথ প্রতিফলিত। ভাষণ থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, '২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। সরকারি কর্মচারীদের বলি: আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ দেবে না।'

রাষ্ট্রনায়কোচিত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক বক্তৃতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রোতাদের শুধু পরিচিত করানোই নয়, বরং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। বঙ্গবন্ধু কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সাধন করেছিলেন তাঁর এ বক্তৃতার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর প্রোৎসাহনমূলক বক্তব্য– 'তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল: প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।' সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এই বক্তব্যকেই হুকুমনামারও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ বলে সেদিন গ্রহণ করেছিল। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধু চরিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণের সময়ও তাঁর মানবিক উদারতার কোনো হেরফের কখনো যে,ঘটেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৭ মার্চের ভাষণ। রাষ্ট্রের জন্ম মৃত্যুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েও তিনি 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব' বলার সাথে সাথেই আবার আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন, 'তোমরা আমার ভাই–তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।' কঠিনের সাথে কোমলের এমন সহাবস্থান উদার-হৃদয় বঙ্গবন্ধুর মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল।

যথাযথ তথ্য চয়নের ফলে বক্তৃতাটি অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর তীক্ষ্ণ যুক্তিবিন্যাসের কারণে শ্রোতাদের মাঝে তীব্র প্রণোদনা সঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়– 'যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য– আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' সহজ ভাষায় এ ধরনের জোরালো যুক্তিবাদ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এক সহজাত বিশেষত্ব। বক্তব্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে সূচনা বক্তব্যের সম্প্রসারণ বা পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয় আজকাল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আশ্চর্যরকমভাবে এ দিকটিও প্রতিভাসিত। যখন তিনি বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে বলেন, 'তাকে আমি বলেছিলাম জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন'।

অন্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গেলেও বঙ্গবন্ধু 'put up the attribution first' -এর নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। বক্তার নাম প্রথম উল্লেখ করে তারপর তার মন্তব্য/বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। যেমন– 'ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না' কিংবা ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন। তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম' ইত্যাদি। সর্বজনীন ভাষণের একটি প্রধান দায়িত্ব কর্মসূচি নির্ধারণ (agenda setting function), যা বঙ্গবন্ধুর এই বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে বার বার। কিন্তু কঠোর কর্মসূচি প্রদানকালেও বঙ্গবন্ধুর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির (humanistic approach) যে, কোনো তারতম্য ঘটত না– তার স্বাক্ষর নিম্নোক্ত বক্তব্য:

'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, ফৌজদারি, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল, কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো–ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না।'

জনযোগাযোগে ব্যক্তি বা ঘটনার মর্যাদা আরোপন (status conferral function) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার বিভিন্ন অংশে এই বিধানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন– তিনি বলছেন, 'আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন' কিংবা 'আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাত-প্রাপ্ত হয়েছে, আমার আওয়ামী লীগ পক্ষ থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব।'

সর্বজনীন বক্তব্যে ও জনযোগাযোগে কার্যকর ফল লাভের জন্য চ্যালেঞ্জ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মৃতির স্মরণে প্রথম স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

’৭০ -এর নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সবচেয়ে বেশি আসনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

উত্থাপনের (posing a challenge) প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত একটি পদ্ধতি। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে যখন বলেন, ‘প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো– এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ’– তখন বোঝা যায় যে তিনি যোগাযোগ বিদ্যার শিল্পকুশল প্রণালিতে পরম দক্ষতার সাথে কীভাবে শ্রোতাদের বক্তৃতার সাথে গেঁথে ফেলেছেন।

যে-কোনো বক্তৃতার সংজ্ঞা নির্ধারণী অংশ সাধারণত শেষেই উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে যোগাযোগবিদদের আধুনিক অভিমত। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের শেষ বাক্য– ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত স্বাধীনতার কার্যত ঘোষণা– যা ৭ মার্চের বক্তৃতার সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত। যে প্রক্রিয়ায় তিনি ভাষণ শেষ করেছেন তা যোগাযোগবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের সাথে হুবহু মিলে যায়। যেখানে বলা হয়– 'Don: drag out your conclusino'। আমরা প্রায়ই ‘পরিশেষে বলছি’, ‘একটি কথা বলেই শেষ করছি’ বা ‘পরিশেষে এ কথাটি না বললেই নয়’ ইত্যাদি ভূমিকা করে বক্তব্য শেষ করি। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু সরাসরি speech defination -এ প্রবেশ করেছেন যা আধুনিক তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগ এবং যা ছিল আটত্রিশ বছর পূর্বে অকল্পনীয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ১৯৪০ সালের ৪ জুন তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন- 'We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.' এখানে ‘We shall fight’ ছিল বক্তৃতার সংজ্ঞা।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং ১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তার সংজ্ঞা অংশ ছিল ‘I have a dream’। উক্ত বক্তৃতার একটি অংশ ছিল নিম্নরূপ:

‘I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident, that all men are created equal. I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin, but by the content of their character.’

আমরা জানি যে, বলিষ্ঠ বক্তব্য সর্বদাই সংক্ষিপ্ত হয়। একাত্তরের ৭ মার্চ তারিখে প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তট-অতিক্রমী ভাষণ তেজস্বী বক্তৃতার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কী দারুণভাবে প্রোৎসাহিত করেছিল– তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের দিক-নির্দেশনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বর সংবলিত এ ভাষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময়োপযোগিতা বিশ্লেষণ গবেষকদের জন্য এক স্বর্ণখনি। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে যেভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল, তা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। সার্বজনিক বক্তৃতা বিশারদ, গবেষক ও যোগাযোগবিদদের জন্য এই ঐতিহাসিক ভাষণ একটি আবশ্যিক পাঠ্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তাচেতনা ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিশীলিত ও স্বচ্ছ উপস্থাপনা সার্বজনিক সম্ভাষণ বা public address- এ অন্যতম শর্ত।

এ প্রসঙ্গে ডেল কার্নেগির উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, ‘The best argument is that which seems merely an explanation’ অর্থাৎ সর্বোত্তম যুক্তি হচ্ছে শুধুই সঠিক ব্যাখ্যা। তৎসময়ের ঘটনাবলির আনুপূর্বিক প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এই ভাষণটিকে সব সময়ের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছে।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক অভিভাষণ বঙ্গবন্ধুর extempore speech হলেও লক্ষণীয় যে উপস্থিত বক্তৃতার সচরাচর পরিদৃষ্ট লক্ষণ যেমন বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, শব্দ চয়নে মুহূর্তের দ্বিধাগ্রস্ততা ইত্যাদি ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোনো টীকা বা নোট ব্যতিরেকে ছেদহীনভাবে এমন নির্মেদ ও নির্দেশনামূলক ও একই সাথে কাব্যময় বক্তৃতা প্রদান একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব বিধায় আন্তর্জাতিক সাময়িকী নিউজউইক তখনই বঙ্গবন্ধুকে ‘রাজনীতির কবি’ বলে আখ্যায়িত করেছিল একাত্তরের ৫ এপ্রিলে প্রকাশিত তাদের প্রচ্ছদ নিবন্ধে। এই বক্তৃতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি বিপ্লব, যার ফলশ্রুতি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। শব্দের এমন সুপ্রযুক্ত ব্যবহার সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় শব্দের ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের (১৭৪৩-১৮২৬) বিখ্যাত উক্তি ‘the most valuable of all talents is that of never using two words when one will do’ আমাদের স্মরণে আসে। ৭ মার্চ একাত্তরের এই ভাষণ বাংলা ভাষায় শুধু শ্রেষ্ঠ ভাষণ নয়, পৃথিবীর এটি একটি অনন্যতম ভাষণ। কারণ এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা।

এ ভাষণ যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জীবিত রাখবে, জীবনসত্য অনুধাবনে পথ দেখাবে ও বাঙালির সার্বিক মুক্তি আন্দোলনকে দেবে রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা।

লেখক : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

একাত্তরের ট্র্যাজেডি

চড়ারহাট গণহত্যা

ডা. নূরল হক

একাত্তর সালের শেষ দিকে বিশেষত ডিসেম্বর মাস থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর ওপর চূড়ান্ত হামলা চালানো হয়। আবাল- বৃদ্ধ-বণিতা দৃপ্ত প্রত্যয়ে গেরিলা হামলা শুরু করে। লক্ষ্য একটাই, দেশকে স্বাধীন করা। সারাদেশ যেন কেঁপে ওঠে বিজয়ের উল্লাসে। দীর্ঘ দু'যুগের শোষিত-বঞ্চিত মানুষগুলোর একটাই আকুতি ছিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থপরতা ও একচোখা নীতি থেকে মুক্তি পাওয়া। সেরকম সময়ই দিনাজপুর জেলাধীন নবাবগঞ্জ থানার ১০ কি.মি. দক্ষিণে চড়ারহাট গ্রামে ঘটে এক নৃশংস ও বর্বরোচিত গণহত্যা।

১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর। তৎকালীন বিরামপুর ইউনিয়নের (বর্তমানে উপজেলা) বিজুল হাটখোলা এলাকার মাটির রাস্তা ধরে এক গরুর গাড়িতে কয়েকজন খানসেনা ক্যাম্পে ফিরছিল। ওত পেতে থাকা নবাবগঞ্জ থানার বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী ও আফতাব উদ্দিন এলএমজি দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে খানসেনাদের হত্যা করে। কিন্তু বেঁচে যায় গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ছাত্তার রাজাকার। পরে সে পার্শ্ববর্তী হাকিমপুর থানার ছাতনী গ্রামে অবস্থানরত খানসেনাদের ক্যাম্পে খবর দেয়।

১০ অক্টোবর, দিনটি ছিল রোববার। রাত প্রায় ২টা। প্রতিশোধের নেশায় হানাদার পাকিস্তানি খানসেনারা রাজাকার আফজাল মৌলভীর নেতৃত্বে নবাবগঞ্জ থানার ৫নং পুটিমারা ইউনিয়নের প্রাণকৃষ্ণপুর ও আন্দোলগ্রাম এবং সরাইপাড়া গ্রাম ঘেরাও করে। খবরটি রাতেই গ্রামের সকলের কাছে পৌঁছে যায়। ভোরবেলা সারা গ্রাম জেগে উঠে। গ্রামজুড়ে থমথমে ভাব, কী হয়, কে জানে? প্রতিটি বাড়ির সামনে খানসেনা আর সাদা পোশাকে রাজাকার ও বিহারী। তারা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বলতে থাকে- ভয়ের কারণ নেই, কেউ পালানোর চেষ্টা করবেন না। ঘোড়াঘাটে ব্রিজ ভেঙে গেছে, লোকজন নিয়ে মাটি কাটতে হবে। তারা গ্রামের মানুষদের কোদাল ও ডালি নিয়ে গ্রামের পূর্বদিকের চড়ারহাট গ্রামের বীজতলাতে জমায়েত হতে বলে। তাদের কথা মতো একমাত্র শিশু, বৃদ্ধ ও নারী ছাড়া গ্রামের পুরুষেরা ভয়ে ভয়ে চড়ারহাটের বীজতলাতে জড়ো হতে থাকে। তখন সকাল আনুমানিক ৭টা। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী পজিশন নিয়ে তাদের দিকে রাইফেল ও মেশিনগান তাক করে আছে। চতুর্দিকে নীরবতা, পাখির কলরবও যেন থেমে গেছে। এক সময় রাজাকারের এক সদস্য তাদের কলেমা পড়তে বলে। শতাধিক মানুষের সমস্বরে কলেমা পড়ার শব্দে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। হঠাৎ রাইফেল আর মেশিনগানের গুলির শব্দ। বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণের সাথে যোগ হলো মরণ চিৎকার। করুণ চিৎকার আর যন্ত্রণায় কাতরানো মানুষের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে শুরু করে একে একে ঐ তিনটি গ্রামের জড়ো হওয়া মানুষেরা। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরানো কেউ কেউ পালানোর চেষ্টা করলেও বুলেটের আঘাতে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এভাবেই গুলি করে নরপিশাচ ঘাতক হানাদারবাহিনী আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব নিরীহ মানুষদের হত্যা করে। রক্তের স্রোত বয়ে যায় বীজতলাতে। রক্তের মধ্যে ভাসতে থাকে মানুষের লাশ। ভাগ্যক্রমে হাতে গোনা ১১ জন জখম অবস্থায় বেঁচে গেলেও মারা যায় ৯৮ জন। পুরুষ শূন্য হয়ে যায় গ্রামগুলোর প্রতিটি পরিবার। স্বামীহারা, ভাইহারা, পুত্রহারা মা-বোনদের আর্তনাদ আর মাতমে সারা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জীবিত স্বজনেরা মৃতদেহগুলো ভালো মতো দেখার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। এমনকি দাফন-কাফনেও তারা থাকতে পারেনি। এমনি এক বিভীষিকাময় অবস্থায় তারা বাধ্য হয় তাদের প্রিয় স্বজনদের গণসমাধিতে সমাহিত করতে। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৭১ সালে এখানে নির্মাণ করা হয় একটি স্মৃতি মিনার।

সেদিনের সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা মনে হলে আজও চড়ারহাটের মানুষদের বুক কেঁপে ওঠে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে স্বাধীনতার ৪০ বছর পর ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে চড়ারহাট বধ্যভূমিতে নবাবগঞ্জ উপজেলার তৎকালীন চেয়ারম্যান বর্তমান দিনাজপুর-৬ আসনের সংসদ সদস্য শিবলী সাদিক শহিদ স্মৃতি মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং নির্মাণ কাজে আর্থিক সহযোগিতা করেন। এরপর ঐ বছরের ১০ অক্টোবর চড়ারহাটের শহিদ স্মৃতি মিনারের ফলক উন্মোচন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এই মিনার নির্মাণে প্রধান উৎসাহদাতা হলেন (প্রয়াত) হিলির গোহারা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা অজিত রায় এবং দিনাজপুর জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ। তাছাড়া এটি নির্মাণে অনেকের মধ্যে বিশেষভাবে হাকিমপুর উপজেলার চেয়ারম্যান আজিজার রহমান এবং বিরামপুর উপজেলার চেয়ারম্যান খায়রুল আলম রাজু এবং জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার সৈয়দ মোকাদ্দেস হোসেন বাবলু ও সেক্টর কমান্ডার ফোরামের সকল সদস্য সার্বিক সহযোগিতা করেন।

লেখক: চিকিৎসক ও সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধু এবং চলচ্চিত্র উন্নয়ন

অনুপম হায়াৎ

দিন যায় কথা থাকে, থাকে ইতিহাসও। সেই ইতিহাস কখনো মোছা যায় না। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস থেকেও তেমনি মোছা যায় না বঙ্গবন্ধুর নাম। আজকে বাংলাদেশে বছরে গড়ে ৮০/৯০টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, কোটি কোটি টাকার পুঁজি লগ্নি হয়। শত শত চিত্রকর্মী নিয়োজিত হয়, ৪০/৪৫ কোটি টাকার রাজস্ব আয় হয় প্রতিবছর এই খাত থেকে। এসবের সূতিকাগার হচ্ছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বা বিএফডিসি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বিএফডিসি'র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫৭ সালে তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী তখন প্রাদেশিক আইন পরিষদ বিল পাসের মাধ্যমে তিনি 'ইপিএফডিসি' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৭ সালে সৃষ্ট পাকিস্তানে বাঙালিদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বপ্নভঙ্গ শুরু হয় নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই। প্রথম আঘাতটা আসে বাংলা ভাষার ওপর। রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দানের প্রশ্নে বাংলা ভাষা হয় উপেক্ষিত, বাঙালি সত্তা ও সংস্কৃতি হয় অপমানিত। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সিভিল মিলিটারি-ক্যাপিটালিস্ট চক্র পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে উঠুক তা চায়নি। তখন পূর্ববঙ্গের প্রায় ১০০টি সিনেমা হলে প্রদর্শিত হতো অস্থানীয় ছবি।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ৩টি ফিল্ম স্টুডিওতে তৈরি হয় অনেক ছবি। এসব ছবির বার্ষিক সংখ্যা ছিল– ১৯৪৮-১, ১৯৪৯-৭, ১৯৫০-১৩, ১৯৫১-৮, ১৯৫২-৭, ১৯৫৩-১০, ১৯৫৪-৭, ১৯৫৫-১৯, ১৯৫৬-২৯, ১৯৫৭-২৭ এবং ১৯৫৮-৩৫। অন্যদিকে আলোচ্য ১০ বছরের মধ্যে ১৯৫৬ সালে আব্দুল জব্বার খানের পরিচালনায় পূর্ব পাকিস্তানে ১টি মাত্র ছবি *মুখ ও মুখোশ* তৈরি হয়। ওই সময় পাকিস্তানের লাহোর ও করাচিতে ৩টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফিল্ম স্টুডিও ছিল। আর তখন ঢাকায় ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হয় ১টি ফিল্ম স্টুডিও ল্যাবরেটরি সরকারি প্রচারচিত্র নির্মাণের জন্য।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত শোকাবহ ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে নতুন চেতনা ও শক্তির জন্ম দেয়। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে, এই ঘটনার স্মরণে প্রকাশিত হয় প্রথম সংকলন। আর মার্চ মাসে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সংস্কৃতিসেবী ড. আব্দুস সাদেকের নেতৃত্বে ইডেন বিল্ডিংস সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১টি সভা। এই সভাতে ঢাকায় একটি ফিল্ম স্টুডিও ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক উর্দুভাষী অস্থায়ী চিত্র ব্যবসায়ী বলেন, এদেশের আদ্র আবহাওয়ায় ছবি নির্মাণ সম্ভব নয়, তার এই নেতিবাচক বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন নাট্যকর্মী আব্দুল জব্বার খান। এদিকে প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলছিল চরম শোষণ, পীড়ন-দমননীতি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়।

বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট প্রদেশের সরকার গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তানি চক্র কাপ্তাই ও আদমজী শিল্প এলাকায় দাঙ্গা বাঁধিয়ে সেই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এক মাসের মধ্যেই বরখাস্ত করে। সেই সঙ্গে তারা বঙ্গবন্ধুসহ আরো অনেক নেতাকে করে গ্রেফতার। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পান ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে চালু হয় নতুন শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র বলে ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রদেশে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু এই মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। তাঁকে দেওয়া হয় শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম দফতরের দায়িত্ব। এ ঘটনার একমাস আগে মুক্তি পায় পাকিস্তানের প্রথম সবাক পূর্ণাঙ্গ বাংলা ছবি *মুখ ও মুখোশ*। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৫৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা দান, ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবসে ছুটির দিন পুনর্বহালের ঘোষণা দেয়। আরো মাস দেড়েকের মধ্যেই এই সরকার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয় এফডিসি বিল পাসের মাধ্যমে।

এফডিসির প্রথম নির্বাহী পরিচালক ছিলেন নাজীর আহমদ (১৯২৫-১৯৮৯)। এর আগে তিনি পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার দফতরের উপপরিচালক এবং চলচ্চিত্র ইউনিটের প্রধান ছিলেন। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি লন্ডন থেকে ঢাকায় এলে আমি তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী হই। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি এফডিসি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

নাজীর আহমদ জানান যে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল কলকাতা থাকতেই। তিনি তখন কলকাতা বেতারে কাজ করতেন। পরে তিনি ঢাকা বেতার, করাচি বেতার এবং বিবিসিতে কাজ করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকায় ফিরে তিনি প্রচার দফতরে যোগ দেন এবং সরকারি প্রচারচিত্র নির্মাণে সহায়তা করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৫৫ সালের জুন মাসে তেজগাঁওয়ে সরকারিভাবে ১টি ফিল্ম স্টুডিও ল্যাবরেটরির কাজ শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হলে নাজীর আহমদ হন তাঁরই শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র বিষয়ের প্রধান। দাপ্তরিক কাজের সূত্রে দু'জনের মধ্যে প্রায়ই চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা হতো। নাজীর আহমদ ১৯৫৭ সালের প্রথমদিকে সরকারি কাজে করাচি গিয়ে জানতে পারেন যে, ওখানে উন্নতমানের ফিল্ম স্টুডিও স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে কর্পোরেশনের মাধ্যমে। তিনি ঢাকায় ফিরে এ ধরনের ফিল্ম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন। সব শুনে বঙ্গবন্ধু তাকে এফডিসি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির নির্দেশ দেন।

নাজীর আহমদ জানান, ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদের শেষদিন। ওই দিন সকালে বঙ্গবন্ধু পরিষদে 'ইপিএফডিসি' বিল উত্থাপন করেন। উত্থাপনের পর সামান্য সংশোধনীসহ বিলটি পাস হয়। আর সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বশালী। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই সেদিন এত দ্রুত এফডিসি বিল পাস হয়। ওই সময় তিনি যদি এই বিল পাস না করতেন তাহলে ঢাকায় এত তাড়াতাড়ি 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (এফডিসি) হতো না।

এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গবন্ধু নাজীর আহমদকে নির্বাহী পরিচালক, আবুল খায়েরকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর আসগর আলী শাহকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেন। ওই সময় বঙ্গবন্ধু ফতেহ লোহানীকে ভাষা আন্দোলনের ওপরও চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেন।

এফডিসি প্রতিষ্ঠার দুমাস পরই বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেন দলের কাজ করার জন্য। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে দেশে জারি হয় সামরিক আইন, অনেকে হন গ্রেফতার, সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুও গ্রেফতার হন। এরপরেই ইতিহাস ভিন্নমাত্রা ও প্রেক্ষিতের।

১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু এফডিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বাংলাদেশকে চলচ্চিত্র শিল্প স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্মিত ছবিতে এদেশের নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলীরা কাজ করবে, এদেশের জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি ধরা পড়বে।

(সূত্রঃ দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকা-১৭/৩/২০০১)

লেখক: চলচ্চিত্র গবেষক

বিজয় দিবস বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা

মাহবুব রেজা

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন
শক, হুন-দল মুঘল-পাঠান
একদেহে হল লীন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এক কবিতায় এই সত্য উচ্চারণ করেছিলেন। কেন করেছিলেন? একটু পেছনে ফিরে গেলে একথার গভীর সত্য উপলব্ধি করতে পারা যাবে। হাজার বছরের বাঙালি জাতিসত্তার উদ্ভব, বিকাশ এবং তার ক্রম বিস্তারের ইতিহাস স্মরণ করতে গিয়েই কবিগুরু একথার অবতারণা করেছিলেন বলে ইতিহাসবিদরা ধারণা করছেন। পৃথিবীর বুকে বাঙালি জাতির যে একটি গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস রয়েছে সে কথার জানান দিতেই কবির এ ঐতিহাসিক উক্তি। ইতিহাসবিদরা বলছেন, প্রাচীনকাল থেকে এদেশে আর্য-অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, মগ, হুন-দল, মুঘল-পাঠান সকলে বাঙালি জাতির মধ্যে মিশে আছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি বাংলাদেশ কখনো এককভাবে স্বাধীন, সার্বভৌম ছিল না। ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবর্তনের পরম্পরা দেখলে আমরা দেখি উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল অবধি বাংলা তথা ভারতে রাজনীতি বা জাতীয়তাবাদের ধারণা স্বচ্ছ হয়ে ওঠেনি। এ উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে পাশ্চাত্যের প্রভাবে। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। ভারতের ইংরেজ শাসনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে কাল মার্কস মনে করেন, ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যিক আর্থসামাজিক কাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস করার কারণে সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থা আগমনের পথ সুগম হয়।

ঐতিহাসিকরা বলছেন, মধ্যযুগে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে বাংলায় রেনেসাঁর সূত্রপাত হলেও বাঙালির জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম কখনো প্রবল সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে দেখা যায়নি। ঈসা খাঁ থেকে ফকির সন্ন্যাসী, দেবী চৌধুরাণী, তিতুমীর, শরীয়তউল্লাহ, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, প্রীতিলতা প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকা সত্ত্বেও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাঙালি জাতিকে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ সময়। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বাঙালি জাতির ইতিহাসে আগমন ঘটে এক মহান মানবের, যিনি বাঙালি জাতির স্বপ্ন পুরুষ, মুক্তির দিশারি। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই মহান মানবের আবির্ভাব এবং তাঁর যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং দিক নির্দেশনা বাঙালিকে দিয়েছে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড। এই মহান পুরুষের জন্য বাঙালিকে অনেক কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। শত শত বছরের শোষণ, বঞ্চনা আর বন্দিত্বের শৃঙ্খল থেকে বাঙালিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন এই সিংহ পুরুষ। তাঁর একক নেতৃত্বে ও সাত মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে ঘুমন্ত জাতি 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে' ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেদিন সাত কোটি বাঙালির সামনে একমাত্র নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসকে বদলে দিতে পেরেছিলেন তাঁর জাদুমাখা ব্যক্তিত্ব আর কারিশমা দিয়ে। বাঙালির বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা ঘুমন্ত স্বপ্নকে বঙ্গবন্ধু বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছিলেন। বাঙালির বুকের ভেতরকার নিভু নিভু আগুনকে তিনি বের করে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব দিয়ে। তিনি যখন উচ্চারণ করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' তখন সেই উচ্চারণ প্রতিটি বাঙালি তাঁদের অন্তরে ধারণ করতে পেরেছিলেন। আর করতে পেরেছিলেন বলেই নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নিতে পেরেছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ-লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। তবে এ স্বাধীনতার ইতিহাস ঠিক কবে থেকে শুরু তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চর্যাপদের কবি ভুসুক যেদিন স্বদেশকে মুক্ত-স্বাধীন দেখার প্রত্যয়ে পদাবলি রচনা করলেন, 'আজি ভুসুক বাঙালি ভইলি' (আজ ভুসুক বাঙালি হলো)–তার এই রচনা বাংলার জাগরণ আর বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণ তথা প্রকারান্তরে স্বাধীনতার পথরেখা তৈরিতে নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক। এর প্রায় ৩শ বছর পর ব্রিটিশ শাসনামলে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে আমরা দেখতে পাই জামালপুর-শেরপুর অঞ্চলে বাঙালি মুসলমান কৃষক নেতা টিপু শাহ্ (টিপু পাগলা), উত্তরবঙ্গ তথা বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের, পশ্চিমবঙ্গের নারকেলবাড়িয়ার মীর নিসার আলী তিতুমীর আর মালদহের দুদু মিয়াকে। আর ত্রিশের দশকে স্বদেশি আন্দোলনের নায়ক মাস্টার দা সূর্যসেন, মহাবিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও অসীম সাহসী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে দেখতে পাই ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে জীবনদান করে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে। পরবর্তীতে বাংলার স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে কৃষক বিদ্রোহের অনন্য বীরগাথাও আমরা বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই। কিন্তু এর বাইরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি, বিপ্লবী রাজনীতি এবং সাহিত্য ও

সংস্কৃতির অবদানও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাঙালির জাতিসত্তা নির্মাণে অসামান্য। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য। আর নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, এ এইচএম কামারুজ্জামান) প্রমুখের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। আর তাঁদের সংগ্রামী জীবন ও রাজনীতির সার-সংস্কৃতি এবং লোকজ-সংস্কৃতির অবদানও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাস, মীর মোশাররফ হোসেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, লালন ফকির, হাছন রাজা, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, পটুয়া কামরুল হাসানসহ অন্যান্য কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-আলোকচিত্রীর বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আর এই সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর নির্মিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র।

ঐতিহাসিকগণ তাঁদের পর্যবেক্ষণে বলছেন, বাঙালিকে শত শত বছরের শাসন আর শোষণ নিষ্পেষিত করে রেখেছিল। ফলে তাদের মধ্যে প্রতিবাদ করার সাহস, স্পৃহা থাকলেও যোগ্য নেতৃত্বের কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। ইতিহাসের নানা পালাবদলের পরম্পরায় বাঙালি সব অন্যায়, শোষণ আর নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করেছে। বিভিন্ন সময় বাঙালি শাসকের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠলেও নানা প্রতিবন্ধকতা এবং যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে তারা সফল হতে পারেনি। তবে বাঙালি সফল হতে না পারলেও তাঁরা তাদের চেতনা ও দেশপ্রেম সৃষ্টিতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। ইতিহাসবিদরা বলছেন, হাজার বছরের অচলায়তন ভেঙে বাঙালিকে মুক্তির পথ দেখাতে এই দেশে জন্মেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব, প্রখর ব্যক্তিত্ব, মেধা, গুণ আর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, স্বকীয়তা দিয়ে বাঙালিকে মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন। বাঙালিকে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস তাদের বুকের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন যেটা এর আগে আর কোনো নেতার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। এখানেই তিনি এই উপমহাদেশে অনন্য নেতায় নিজেকে পরিণত করতে পেরেছিলেন। এ এক নজিরবিহীন ঘটনা।

ইতিহাস গবেষকরা পৃথিবীর দেশে দেশে স্বাধীনতার ইতিহাস ও এর পূর্বাপর তুলে ধরে বলেছেন, একটি দেশের, একটি জাতির স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংগ্রামের ইতিহাস বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও ঘটনাবহুল। তারা বলছেন, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সেই দূর অতীতে না গেলেও নিকট অতীতের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতের হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এবং বাংলার অধিকাংশ মুসলমানের সমর্থনে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পূর্ব পশ্চিমের হাজারো মাইল ব্যবধানে শুধু ধর্মীয় বন্ধনে গঠিত এই রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যায় খাটে না। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দু'অঞ্চলের অবস্থান এক নয় উল্লেখ করে তারা বলছেন, পূর্ব বাংলার জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ঘোষণা করার

বিজয়ের পর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী জনগণ

পর পূর্ব বাংলায় ছাত্র-জনতা, রাজনীতিবিদ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। এরই পরিণামে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। একুশের চেতনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে সফল হয়। একুশের চেতনায় সফল বাঙালি ৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, এরপর '৫৮-এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন এবং '৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায় চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে আর সেই চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা আন্দোলনকে বেগবান করে। পরবর্তীতে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয় এদেশের গণমানুষের জন্য এক আশীর্বাদ। বাঙালির এসব বিজয়ের নেপথ্যে এককভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু।

সত্তরের বিজয়ের পরও শোষকরা বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতায় বসতে দেয়নি। টালবাহানা চলতে থাকে একের পর এক। এসময় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পূর্ব বাংলা চলতে থাকে। একাত্তরের ৩ মার্চ পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। এরপর ৭ মার্চের লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসমুদ্রে বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের মহানায়ক ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণটি দেন তিনি-এরপরের ইতিহাস তো বিশ্ব জানে। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ পরিণত হলো বাঙালির মুক্তিসনদে। দেশ স্বাধীন হলো। বঙ্গবন্ধুর আজন্ম স্বপ্ন, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবে প্রতিফলিত হলো।

২৩ মার্চ ১৯৭১ : ৩২নং সড়কের ধানমন্ডির বাড়িতে উৎফুল্ল জনতার মাঝে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে ধরলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অবশেষে যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি বিজয় ছিনিয়ে আনে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। দেশ স্বাধীনের পর '৭২-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশকে পুনর্গঠন করতে শুরু করার কাজে হাত দেন এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে একটি অসাধারণ সংবিধান প্রণয়ন করেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতিসহ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ নানা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধুর এসব পরিকল্পনাকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তারা চেয়েছে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা যেন পিছিয়ে থাকে। তাই যুদ্ধের পর থেকে তারা ষড়যন্ত্রে মেতে ছিল– কীভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে থামিয়ে দেওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতাবিরোধী ফ্যাসিস্ট শক্তি ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই অপশক্তি শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই বসে থাকেনি, তারা জেলখানার অভ্যন্তরে বন্দি থাকা অবস্থায় চার জাতীয় নেতাকেও নির্মমভাবে হত্যা করে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় তৈরি করে। তারপর বাংলাদেশের বুকে নেমে আসে এক দীর্ঘ অন্ধকার। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে। কেটে যায় অপেক্ষার দীর্ঘ প্রহর।

একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভের পর সরকার গঠন করে। সেই থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শুরু হলো বাঙালির দ্বিতীয় অগ্রযাত্রা। পিতার যোগ্য কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনা ইতিহাসের দায়মুক্তির পথে চলতে শুরু করলেন। দেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা, গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা, মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ও আদর্শের জায়গায় নিয়ে সবাইকে একত্র করে শুরু করলেন এক নতুন অভিযাত্রার। বাংলাদেশের এই উন্নয়নের অভিযাত্রায় দেশের মানুষ একাত্মতা ঘোষণা করে নেমেছে এক অলিখিত যুদ্ধে– যে যুদ্ধে বাংলাদেশ পৃথিবীর ইতিহাসে রচনা করবে আরেকটি ইতিহাস। যেমন করে বাঙালি একাত্তরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে রচনা করেছিল এক যুগান্তকারী ইতিহাস– যে ইতিহাসের মহানায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বর্তমানে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পিতার মতো বাংলাদেশকে উন্নয়নে, গণতন্ত্রে, মানবিকতায়, নেতৃত্বে পৃথিবীর বুকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে যাবেন– এটাই এদেশের মানুষের প্রত্যাশা।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যা

আসাদুজ্জামান চৌধুরী

বুদ্ধিজীবী কারা? এ প্রশ্নের বিশদ তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন দু'জন বড়ো মাপের বুদ্ধিজীবী। এর একজন হলেন ইটালির বিশ্ববিখ্যাত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক আন্তনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭)। ফ্যাসিজমের ভয়াবহতা এবং মার্কসিস্ট বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ তাত্ত্বিক প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর কয়েক খণ্ডের বিখ্যাত Note Book সিরিজের Prison Note Book-এ। গ্রামসি ছিলেন ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ইটালির পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্য। পার্লামেন্টে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় (মে ১৯২৫) ফ্যাসিজমকে তীব্র ভাষায় তিনি আক্রমণ করেন। স্বয়ং ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনি এ ভাষণ শুনেছিলেন। ফলে ১৯২৬ সালের ৮ নভেম্বর মুসোলিনির পুলিশ ফ্যাসিবাদবিরোধীদের জেলে পুরে রাখার অংশ হিসেবে অন্য অনেকের সঙ্গে গ্রামসিকেও কারাগারে নিক্ষেপ করে। একটি ফ্যাসিস্ট স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার হয় এবং ওই ট্রাইব্যুনাল তাঁকে বিশ বছর চার মাস পাঁচ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। তাঁকে এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তর করা হলেও আর কখনই মুক্তি দেওয়া হয়নি। ফলে ভগ্নস্বাস্থ্যের গ্রামসি অসুখ-বিসুখ এবং চিকিৎসার অভাবে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন (১৯৩৭)। এই হলো এক প্রকৃষ্ট বুদ্ধিজীবীর প্রতিকৃতি। গ্রামসির এই অনন্যসাধারণ ভূমিকার সঙ্গে ইরানের বুদ্ধিজীবী তকি ইরানির তুলনা চলে। তাঁকেও কনডেম সেলে রেখে এভাবে তিল তিল করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয় ১৯ শতকের রুশ ডিসেমব্রিস্ট আন্দোলনের নেতা কবি রিলিয়েভকে। গিনি বিসাওয়ের বিপ্লবী লেখক ও সংস্কৃতি-তাত্ত্বিক আমিলকার কাব্রালও ছিলেন এমনই এক বুদ্ধিজীবী। মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করতে করতে তিনি শহিদ হয়েছেন। যা হোক, অপর যে বুদ্ধিজীবী তাত্ত্বিকভাবে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা নির্ধারণ করেছেন তিনি হলেন একালের বিখ্যাত আরব আমেরিকান বুদ্ধিজীবী-লেখক-অধ্যাপক ও 'Orientalism' খ্যাত এডওয়ার্ড ডাব্লু সাইদ।

তাঁর বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা সংক্রান্ত বইয়ের নাম 'Representation of the Intellectuals'. শিক্ষিত বা ডিগ্রিধারী কোনো পেশাজীবী হলেই তিনি বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন এমন নয়। অধ্যাপক-শিল্পী-গায়ক এরাও ঢালাওভাবে বুদ্ধিজীবী বলে বিবেচিত হবেন এমন ধারাও ঠিক নয়। সকল শিক্ষিত লোকই বুদ্ধিজীবী নন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বুদ্ধিজীবী। এই 'কেউ কেউ' কারা সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা ব্যক্ত হয়েছে আমাদের এই আলোচনার সূচনা-পর্বে। যিনি জনগণের কথা বলেন এবং চিন্তাশীলতার সঙ্গে তার প্রকাশ ঘটান তিনি বুদ্ধিজীবী। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী কারা তার উদাহরণ হিসেবে গ্রামসি, তকি ইরানি, কডওয়েল, কাথ্রন্স, ফানো এবং স্পেনে গৃহযুদ্ধের সময় আগ্রাসী শক্তির সঙ্গে যাঁরা যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তাঁদের নাম আমরা বলতে পারি। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে অস্ত্র হাতে যিনি ১৯৭১-এ বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিলেন, সেই ফরাসি দার্শনিক আঁদ্রে মার্লোর নামও এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর এই তালিকায় বাংলাদেশের অবদানও সামান্য নয়। এদেশের বহু কৃতী সন্তান এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। অনেকে চমকে উঠলেও আমি প্রথমেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম উল্লেখ করব। বাংলাদেশে সুস্থ চিন্তার বিকাশ এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র নির্ধারণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভূমিকা বৈপ্লবিক। স্মরণ করুন, ১৯৪৮-এ তিনি বলছেন, 'পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ'; ১৯৫১-এ বলছেন, 'পূর্ব-বাংলার জনগণের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিলে তা হবে গণহত্যার শামিল' এবং 'প্রয়োজন হলে আমি একাই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

১৯৭১-এর ২৫ মার্চের কালরাত্রি থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধকালীন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের কয়েকজন

করব' অথবা তাঁর অবিস্মরণীয় উক্তি, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বড় সত্য আমরা বাঙালি'।

এসব উক্তির জন্যই পূর্ব পাকিস্তানের পাঞ্জাবি গভর্নর ফিরোজ খান নূন তাঁকে বলেছিলেন, Pundit you are a traitor' রোকেয়ার বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা এখন কে না জানে! বাংলাদেশের অন্য বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা হলেন সাহিত্যিক-তাত্ত্বিক-সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে জামায়াতের গোপন সংগঠন রাজাকার, আলবদর, আল শামস-এর হাতে নিহত সাহিত্যিক সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার, চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান, মুনীর চৌধুরী, সাংবাদিক সিরাজউদ্দীন হোসেন, ডা. আলিম চৌধুরী, ডা. মুর্তজা এবং পাক-হানাদার হায়েনাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত গণশিল্পী ও একুশের গানের অমর সুরস্রষ্টা আলতাফ মাহমুদ। এদের মতোই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাঙালিত্বের প্রতিষ্ঠায় আজীবন নিয়োজিত মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বী, সাংবাদিক নাজিমুদ্দীন, প্রফেসর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, সন্তোষ ভট্টাচার্য, গিয়াসউদ্দিন এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় দার্শনিক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে ধর্মান্ধ পাক-পছন্দ ফ্যাসিস্টদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। বাংলার এই সূর্য সন্তানদের স্মৃতি জাতি কোনোদিন ভুলবে না।

বুদ্ধিজীবী কারা? এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার জন্য আমরা চেষ্টা করব। সমাজ সচেতন, মানবিক চৈতন্য-ভাস্বর, শোষণ-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠের অধিকারী শিল্পী, সাহিত্যিক, সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানসাধক এবং সাংস্কৃতিকভাবে সাক্ষর সক্রিয়তাবাদী বা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারেন। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে দু'আড়াই হাজার বছর ধরেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রপথিকেরা বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছেন। সক্রেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো থেকে গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, চার্লস দারওয়িন, রুশো, ভল্টেয়ার, আইনস্টাইন, রমাঁ রলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী-এঁরা বিশ্ববিখ্যাত বুদ্ধিজীবী। এঁরা অজ্ঞানতা, বিজ্ঞানবিরোধিতা, স্বৈরাচারবিরোধিতা যেমন করেছেন তেমনি ফ্যাসিজম ও মানবতার বিরুদ্ধে নানা অপতৎপরতাকে রুখে দাঁড়িয়েছেন অঙ্গীকারদীপ্ত দার্ঢ্যে। স্মরণ করুন ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ শাসকদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে অসামান্য প্রতিবাদী চিঠি লিখে বিশ্বকবির ইংরেজদের দেওয়া নাইটহুড পরিত্যাগের কথা। আর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তো ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কারারুদ্ধ হয়েই তাঁর দ্রোহী ভূমিকাকে সোচ্চার করে তুলেছিলেন।

বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীরা মধ্যযুগ থেকেই প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা মানবতার জয়গান গেয়েছেন বিশ্বকে চমকে দেওয়ার ভাষায়। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতকেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন : 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পশ্চিমা বিশ্বে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে যখন রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়ে মানুষকেই সবকিছু বিচারের মাপকাঠি গণ্য করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবিচারভিত্তিক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তখন বঙ্গদেশেও তার মূলকথাটির প্রতিধ্বনি উঠেছিল কবিকণ্ঠে। বাংলা ও বাঙালির জন্য এ কম গৌরবের কথা নয়। বুদ্ধিবৃত্তিকতার উৎকর্ষ, মানবতার জয়গান, মাতৃভাষা ও দেশপ্রেমও নানা আঙ্গিক ও মাত্রিকতায় প্রকাশ পাচ্ছিল বাংলার মুসলিম কবিদের রচনায়। আলাওল, দৌলত কাজী, সৈয়দ সুলতানে যেমন কাব্যকলাগত উচ্চমান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে, তেমনি লোককবিতায় আছে মানবতার অনিন্দ্যসুন্দর প্রকাশ; আবার সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিমে এসে পাই মাতৃভাষাবিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তিমূলক উচ্চারণ।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের উত্তরসূরি হিসেবে বাংলাদেশে আবুল ফজল, শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, কবীর চৌধুরী, আবদুল হক, শামসুর রাহমান, বদরুদ্দীন উমর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, হুমায়ুন আজাদ, মুনতাসীর মামুন, সেলিনা হোসেন, যতীন সরকার, শাহরিয়ার কবির তাঁদের লেখার মাধ্যমে জনগণের পক্ষেই দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। সামাজিক অগ্রগতি, শ্রেয়োবোধের প্রতিষ্ঠা ও মানবিকতার পক্ষে এদের ভূমিকা শ্রদ্ধেয়। শাসক, শোষক, নির্যাতক এবং অপশাসন-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এদের কলম অকুতোভয়। এরা লেখা এবং সমাজবদলের বাস্তবিক সংগ্রামে সক্রিয়ভাবেই নিয়োজিত আছেন। এদের এই ভূমিকা সচেতন ও সক্রিয় বুদ্ধিজীবীরই ভূমিকা। যে অর্থে এডওয়ার্ড সাইদ বা নোয়াম চমস্কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠানবিরোধী এবং মার্কিন সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কট্টর সমালোচক ও বিশ্বব্যাপী সচেতন মানুষের শ্রদ্ধেয়, বাংলাদেশে উপর্যুক্ত কেউ কেউ তাঁদের মতোই নিজ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচক। কেউ কেউ ভারতের অরুন্ধতী রায়ের মতো খাপখোলা তলোয়ার না হলেও কাছাকাছি তো বটেই।

বুদ্ধিজীবী কীভাবে হওয়া যায়? শুধু বুদ্ধি, চালাকি ও বুদ্ধি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করলেই বুদ্ধিজীবী হওয়া যায় না। আসলে 'Intellectual'-এর বাংলা 'বুদ্ধিজীবী' করাটা যথাযথ হয়নি। 'Intellectual' শব্দটির মূলগত অর্থের সঙ্গে 'Rationality' এবং 'Enlightenment'-এর যোগ আছে। Superior Intellect + Rationality + Enlightenment= Intellectual. চার্চিল, যতদূর মনে হয়, এই অর্থেই বুদ্ধিজীবীকে বুঝতে চেয়েছিলেন। তাঁর সংজ্ঞায়, 'তিনিই বুদ্ধিজীবী যিনি কোনো ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করে তার একটি যুক্তিনিষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন। আবার যদি ঘটনাটা তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মতো না ঘটে অন্যরকমভাবে ঘটে, তাহলে কেন সেভাবে ঘটল তার ব্যাখ্যা যদি যুক্তিনিষ্ঠভাবে দিতে পারেন তবেই তিনি বুদ্ধিজীবী।' এ সংজ্ঞায় সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে গভীরতর বোধ-বিবেচনাসম্পন্ন গতিশীল ও সুউচ্চ মানসিক শক্তির ব্যক্তিকেই বুদ্ধিজীবী বলা হয়েছে। এই অর্থে চার্চিল বা রাসেল বা আইনস্টাইন অবশ্যই বুদ্ধিজীবী। তবে আইনস্টাইন এবং রাসেল শুধু Superior Intellect-এর জন্য বুদ্ধিজীবী হননি। মানবিকতা এবং মানবসভ্যতার সংকটে তাঁদের উদ্বেগ এবং সেই সংকট নিরসনে তাঁরা যে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন সেজন্যই তাঁরা বিশ্বনন্দিত বুদ্ধিজীবীর সম্মান পেয়েছেন। আইনস্টাইন যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ, অঁরি বারবুস, রমাঁ রলাঁ প্রমুখকে নিয়ে সংগঠন করেছিলেন : League Against Fascim And War. এই সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বের প্রগতিবাদীরা সম্মিলিতভাবে ফ্যাসিবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

যোসেফ স্টালিন বুদ্ধিজীবীদের আখ্যায়িত করেছিলেন 'আত্মার কারিগর' হিসেবে। আমাদের মতে, আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবীরা, বহুলাংশেই ছিলেন যেন আত্মার কারিগরই। 'আত্মার কারিগর' কথাটার সঙ্গে মনে হয় যেন সংস্কৃতির সংযোগটা খুবই ওতপ্রোত। আমাদের মহান শহিদ বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত ছিলেন সংস্কৃতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রের দিকপাল। সাংবাদিক, চিকিৎসক ও পেশাজীবীরাও ছিলেন বাংলা ও বাঙালিত্বের নব-নির্মাণের কারিগর। আর বাঙালিত্বের সঙ্গে মনুষ্যত্বের সাধনার সংযোগ ঘটিয়ে একটি বাঙালি রাষ্ট্র গড়ে তোলার শেখ মুজিবের স্বপ্নের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়েছিলেন, সেই রাষ্ট্রে তাঁরা বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিশ্বজনীন মানস হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে করতে চেয়েছিলেন তাঁদের 'সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ'। পাকিস্তানপন্থি, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভববিরোধী জামায়াত-শিবির, আল বদর-আল শামসরা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ওই ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে মেধাশূন্য করার জন্যই পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করে।

লেখক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আহসান এইচ মনসুর

নির্বাহী পরিচালক, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা

এম এ খালেক: স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে তাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

ড.আহসান এইচ মনসুর: বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অর্থনৈতিক পটভূমি ছিল। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) প্রতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছিল। নানাভাবে এই অঞ্চলের মানুষকে ঠকানো হচ্ছিল। ন্যায্য অধিকার দেওয়া হচ্ছিল না। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মাঝে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য খুবই প্রকট এবং দৃশ্যমান ছিল। যে কারণে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধে। স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে ৬ দফার যে রূপরেখা দেওয়া হয় তার অন্যতম উপলক্ষ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ যেন পূর্ব পাকিস্তানেই থাকে, পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক বৈষম্যই বিভিন্ন আন্দোলনের পেছনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। আমরা যারা বাংলাদেশের অধিবাসী তারা মনে করতাম, আমরা আরো অনেক বেশি সম্পদের অধিকারী হতে পারতাম। আমাদের সম্পদ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের দেশে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলছে। কিন্তু তার সুফল এই অঞ্চলের মানুষ পাচ্ছিল না। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে উন্নয়নের সুফল আমরা ভোগ করতে পারিনি। যেহেতু একটি সার্বিক যুদ্ধ এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে তাই প্রথমদিকে আমাদের নানা ধরনের অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। বৈশ্বিক লেনদেনের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করার ব্যাপারে বড়ো ধরনের সমস্যা ছিল। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ছিল না। টাকা পেতে হলেও টাকা দিতে হয়। বিশ্বব্যাংকের সদস্য হবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন হয় তা বাংলাদেশ দিতে পারেনি। কানাডা সরকার সেই টাকা দিয়েছিল। পরে অবশ্য বাংলাদেশ কানাডা সরকারকে টাকা ফেরত দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সদস্য হবার জন্য যে, টাকা দিতে হয় তা দেবার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। এটা ইঙ্গিত করে যে, স্বাধীনতার পর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কতটা ভঙ্গুর এবং নাজুক ছিল। বাংলাদেশ ছিল তখন সবেমাত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী একটি দেশ। যে দেশের অর্থনীতি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আমাদের কোনো স্বর্ণের ভাণ্ডারও ছিল না, বিমান বহরে কোনো বিমান ছিল না। সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ছিল ভাঙা। এসব অবকাঠামো পাকিস্তানিরা ধ্বংস করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও যেন টিকে থাকতে না পারে। চট্টগ্রাম বন্দরে মাইন পেতে রাখার কারণে কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল। সেই যে ধ্বংসপ্রায় অবস্থা সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সহজ কাজ ছিল না। সবকিছু রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা হয়। বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন দেশ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে তার অর্থনৈতিক মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে। এটা সে সময়ের জন্য যুগোপযোগী ছিল। কারণ তখন বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের জোয়ার চলছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে রাশিয়া আমাদের সর্বোতভাবে সহায়তা করেছিল। এছাড়া পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া সম্পদ এবং কলকারখানা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এগুলোকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসাটা জরুরি ছিল। মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। ফলে বাংলাদেশ বোধগম্য কারণেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানে ৪ মৌল নীতির অন্যতম ছিল সমাজতন্ত্র। মূলত এসব কারণেই ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। শুধু যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া সম্পদই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হয় তা নয় এদেশীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু '৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর আমলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কলকারখানা ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের নামে পানির দামে এগুলো ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়। শুরু হয় অরাজকতা। ফলে যেভাবে উন্নতি অর্জিত হবার কথা ছিল তা হয়নি। দেশের প্রত্যেক সেক্টরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতার পর পরই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়। পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল তার প্রভাব আমাদের দেশের উপরও পড়ে। ১৯৭৪ সালের যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তার পেছনে মূলত আন্তর্জাতিক রাজনীতিই দায়ী। এমনই এক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। কাজেই আমি বলব, স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম তিন/চার বছর আমাদের অর্থনীতির ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল খুবই কঠিন। যদি আমাদের অর্থনৈতিক ভিতটা দৃঢ় থাকত এবং পাকিস্তানিরা আমাদের সবকিছু ধ্বংস করে না দিত তাহলে এমন সমস্যার সৃষ্টি হতো না। দেশি-বিদেশি নানা চক্রান্তের ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে

পড়ে। বঙ্গবন্ধু শক্ত হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। আমাদের ব্যক্তি খাতের বৈশিষ্ট্য হলো তারা খুবই দক্ষ, উদ্যমী এবং কার্যকর। তারা যে-কোনো ঝুঁকি গ্রহণে অভ্যস্থ। বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। যে কারণে বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি সুন্দর অবস্থান সৃষ্টি করে নিতে সমর্থ হয়েছে। আগামীতে এই অবস্থান আরো সুদৃঢ় হবে এটা প্রত্যাশা করা অন্যায় হবে না। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশ কার্যকর মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে চলে আসবে। এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যমাত্রা।

যখন আমরা নতুন দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করি তখন আমাদের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় ছিল মাত্র ১২০ মার্কিন ডলারের মতো। কোনো কোনো সময় এটা হ্রাস পেয়ে ১০০ মার্কিন ডলারের নিচেও চলে আসে। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় অনেক দিন পর্যন্ত ('৮০'র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত) এভাবে উঠানামা করছিল। ১৯৭৫ পরবর্তী প্রায় ১৫ বছর আমরা একটি স্থবিরতার মধ্যে ছিলাম। সেই অবস্থা থেকে আমাদের যে উত্তরণ তা বিস্ময়করই বটে। এটা একটি বিরাট অর্জন যে, বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলারে। বাণিজ্য এবং অর্থনীতি উদারীকরণের ফলে প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সাফল্য লক্ষ করছি তা অনেকটাই উদারীকরণের ফল। আমাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে তাহলো,কোনো সংস্কারই চিরস্থায়ী নয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে-কোনো সংস্কার কার্যক্রমকে নতুন করে সংস্কার করতে হয়। এটা করা না হলে সংস্কারের গতিশীলতা হারিয়ে যায়। '৯০-এর দশকে যে অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় তার ফল আমরা এখন ভোগ করছি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে অনেক দূর এগিয়ে যায়। বর্তমানে আমাদের খাদ্য সহায়তার প্রয়োজন হয় না। আমরা ইতোমধ্যেই খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। এটা স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি বিরাট অর্জন। অনেকেই বলে থাকেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছে গণতান্ত্রিক পরিবেশ।

এম এ খালেক: আপনি তো সংস্কার কার্যক্রমের কথা বললেন। সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সত্ত্বেও দেশের ব্যাংকিং সেক্টরের অবস্থার দৃশ্যমান কোনো উন্নতি হচ্ছে না কেনো?

ড. আহসান এইচ মনসুর: যে কোনো সংস্কার কার্যক্রম যখন চলে তার ফল তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় না। এর ফল পেতে হলে অপেক্ষা করতে হয়। আমাদের অর্থনীতিতে যে গতিশীলতা চলছে তা মূলত দুটি কারণে হচ্ছে। প্রথমত হচ্ছে আগের সংস্কার কার্যক্রমের অব্যাহত সুফল বা প্রভাব এবং দ্বিতীয়ত, বর্তমানে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক্যাল ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। এর সুফল আমরা পাচ্ছি। আমাদের শ্রমশক্তির প্রবৃদ্ধি হয় বার্ষিক ৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতিবছর শ্রম বাজারে তিন শতাংশ নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে। তিন শতাংশ জিডিপি আমরা সেখান থেকেই পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের আরো যে সব সম্ভাবনা আছে তা আমরা অনুধাবন করতে পারছি না। এটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্তমানে আমাদের জন্য একটি খুব মূল্যবান সময় যাচ্ছে। এই সময় হয়ত আরো ২০ বছর পাব। কিন্তু তারপর এই অবস্থা থাকবে না। সরকার ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট সম্পর্কে কতটা সচেতন। আমাদের দেখতে হবে অন্যান্য দেশ এই অবস্থায় কীভাবে সফলতা অর্জন করেছে। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

এম এ খালেক: আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য কতটা বলে মনে করেন?

ড. আহসান এইচ মনসুর: বাংলাদেশ এখনো একটি দরিদ্র দেশ। দরিদ্র দেশে সমতাঁা বেশি থাকে। একটি দেশ যত বিত্তবান হতে থাকে অর্থনৈতিক বা সম্পদের বৈষম্য ততই বাড়তে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে বিত্তবান দেশ। সেখানে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ মানুষের হাতে যে সম্পদ রয়েছে অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশ মানুষের হাতে সেই পরিমাণ সম্পদ নেই। বিশ্বব্যাপী এই একই রকম অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজ করছে। সেই বিবেচনায় আমি বলব, বাংলাদেশের অবস্থা এখনো অনেক ভালো। বাংলাদেশে বিত্তবান-বিত্তহীনের মাঝে বৈষম্য আছে তবে তা অসহনীয় পর্যায়ে নয়। তবে এতে সন্তুষ্ট হলে চলবে না। কারণ সম্পদের বৈষম্য আমাদের দেশেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নের গতি যত বৃদ্ধি পাবে সম্পদের বৈষম্য ততই বাড়তে থাকবে। এ জন্য সরকারকে আগে থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে তা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে প্রভাবিত করবে। সবাইকে নিয়েই আমাদের এগুতে হবে। এসডিজি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান হচ্ছে সবাইকে সাথে নিয়ে এগুতে হবে। কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তবে আরো অনেক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে কর ব্যবস্থাপনার আমুল সংস্কারের মাধ্যমে সম্পদ একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে পুঞ্জীভূত হবার প্রবণতা হ্রাসের উদ্যোগ নিতে হবে।

এম এ খালেক: আমাদের দেশে উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। এই কর্মসংস্থানবিহীন উন্নয়ন জাতির জন্য কী বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে মনে করেন?

ড.আহসান এইচ মনসুর: আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। বলা হতো তৈরি পোশাক শিল্পে ৪০ লাখ মানুষ কর্মরত রয়েছে। এখনো কিন্তু সেই ৪০ লক্ষ মানুষই সেখানে কাজ করছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না। উৎপাদন বাড়ছে। উৎপাদনশীলতাও বাড়ছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। চীন তুলনামূলক সস্তায় ক্যাপিটাল মেশিনারি তৈরি করছে। ফলে সাধারণ মানুষও কম মূল্যে এসব মেশিনারি কিনতে পারছে। ফলে সাধারণ শ্রমশক্তির কাজের ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এছাড়া আমরা যাদের বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রেরণ করছি তাদের দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ফলে অন্য দেশের শ্রমিকরা যেখানে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে সেখানে বাংলাদেশের একজন শ্রমিক তুলনামূলক কম মজুরি পাচ্ছে। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, বিদেশে শ্রমিক পাঠানো বেকারত্ব নিরসনের দীর্ঘ মেয়াদি সমাধান হতে পারে না। যে-কোনো মূল্যেই হোক আমাদের অভ্যন্তরীণভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না পাবার একটি বড়ো কারণ হচ্ছে দেশে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ফলে সাধারণভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। আমরা তো প্রযুক্তিকে অস্বীকার করতে পারি না। তাই কর্মসংস্থানের বিকল্প ভাবতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: এম এ খালেক

জাতীয় জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ঢাকার জাদুঘর

বরুণ দাস

দেশের জন্যে লাখো মানুষ
জীবন দিলো হেসে
দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ হলো
বিজয় এলো শেষে।

১৯৭১-এর ডিসেম্বর মাসটি আমাদের জীবনে একটি ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসে। এটি আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণায় প্রত্যয়বদ্ধ হওয়ার মাস। নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শপথ নেওয়ার মাস। ১৯৭১-এর মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর– এই দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর চালিয়েছে নির্মম, অকথ্য, অসহনীয় অত্যাচার। লাখ লাখ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। অমানবিকভাবে হত্যা করেছে তিরিশ লাখ নিরীহ নারী-পুরুষকে। সম্ভ্রমহানি করেছে অসংখ্য নারীর। এতকিছুর পরও বিশ্বের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল বাংলাদেশ। সেইসব গৌরবগাথার অনেককিছুই সংরক্ষিত আছে ঢাকার বিভিন্ন জাদুঘরে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

রাজধানীর কর্মব্যস্ত এলাকা শাহবাগে অবস্থিত জাতীয় জাদুঘর। বর্তমানে এর নিদর্শনের সংখ্যা ৮৬ হাজারেরও বেশি। প্রায় সাড়ে আট একর পরিমাণ জমির ওপর গড়ে ওঠা চারতলাবিশিষ্ট এ ভবনে নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য রয়েছে ৪৫টি গ্যালারি। দোতলা, তিনতলা ও চারতলায় অবস্থিত এ গ্যালারিগুলোতে ৩০ হাজার নিদর্শন উপস্থাপিত আছে। বাকি নিদর্শনগুলো আছে গুদামজাত অবস্থায়। পালা করে এসব নিদর্শন গ্যালারিতে প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্যে ৩৮, ৩৯ এবং ৪০ নম্বর গ্যালারিতে রয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন নিদর্শন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আমাদের এ যাবৎকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। সেই মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ ঢাকার ৫ নম্বর সেগুনবাগিচায় সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘর গড়ে উঠেছিল ১২ কাঠা জায়গা নিয়ে। প্রতিষ্ঠার ২১ বছর পর নিজস্ব ভবন এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, ঢাকা– এই ঠিকানায় চলতি বছর স্থানান্তরিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

এই জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারিতে রয়েছে– পাকিস্তানি শাসনামলের শুরু থেকে ১৯৭০-এর নির্বাচন পর্যন্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যান্য নিদর্শন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের উদাত্ত ভাষণের ঐতিহাসিক আলোকচিত্র, রয়েছে ২৫ মার্চের কালোরাত্রি, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকচিত্র এবং ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র। এছাড়াও রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদানের নানা তথ্য, রয়েছে প্রতিরোধ লড়াই, গেরিলা যুদ্ধ,

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর

সোহরাওয়ার্দী পাতাল জাদুঘর

বর্তমানে আমরা যে জায়গাটিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে চিনি বা জানি, পূর্বে এর নাম ছিল রমনা রেসকোর্স ময়দান। পরে বাংলার মহান রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে এর নামকরণ করা হয়। নানা কারণেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বাংলার ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান হিসেবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

একাত্তরসহ অন্যান্য সকল ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত এই উদ্যানে নির্মিত হয়েছে একটি পাতাল জাদুঘর। এই জাদুঘরে প্রবেশের পর প্রথমেই হাতের ডানে রয়েছে অডিও ভিজ্যুয়াল রুম। তারপর শুরুতে আছে বড়ো আকারের খোলা গ্যালারি; যেখানে স্থান পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির ছবি এবং লিখিত দলিলসহ চমৎকার ওয়াটারফল।

গ্যালারিতে যাওয়ার পথের দু'পাশের দেয়ালে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ছবি। পরের খোলা গ্যালারিতে রয়েছে ড. হেনরি কিসিঞ্জারের কাছে পাঠানো স্যামুয়েল হসকিনস-এর গোপন দলিল। এখানে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা ৩১ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স মযদানে যে টেবিলটির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন তার অনুকৃতি টেবিল। আছে বেতার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার দালিলিক প্রমাণপত্রাদি। রয়েছে ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের মুহূর্তের বেশ বড়ো আকারের একটি ছবি।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন, বৈদেশিক সমর্থন বিশেষ করে ভারতীয় জনসাধারণের সমর্থনের প্রতিচ্ছবির নানা তথ্য সম্ভার। আছে গণহত্যা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, বীরশ্রেষ্ঠ, শহিদ বুদ্ধিজীবী, চূড়ান্ত লড়াই ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয় সম্পৃক্ত বিভিন্ন স্মারক, বিবরণ ও ছবি। সেইসাথে রয়েছে পাকবাহিনীর বর্বরতা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, প্রাথমিক প্রতিরোধ, প্রবাসী সরকার ও সেক্টর কমান্ডারদের তৎপরতার বিবরণ। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীসভা ও প্রশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন জিনিসপত্র, দলিল, সেক্টর কমান্ডারদের ব্যবহৃত সামগ্রীও রয়েছে বিভিন্ন গ্যালারিতে।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর

ঢাকা শহরের প্রসিদ্ধ একটি আবাসিক এলাকার নাম ধানমন্ডি। এখানকার ৩২ নম্বর সড়কের ১০ নম্বর বাড়িতে ১৯৬১ সাল থেকে সপরিবার বাস করতেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই বাড়িটিই কালের পরিক্রমায় আজ 'বঙ্গবন্ধু ভবন' বা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' হিসেবে পরিচিত।

যেসব কারণে এই বাড়িটির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে– ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের এই বাড়ি থেকেই ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তিসনদ ঐতিহাসিক ৬ দফার ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত মোট ১২বার বঙ্গবন্ধু এই বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন। এই বাড়ি থেকেই পরিচালিত হয়েছে ১৯৬৯-এর ঐতিহাসিক ছাত্র গণঅভ্যুত্থান। পরিচালিত হয়েছে ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মার্চব্যাপী ইতিহাসের নজিরবিহীন অসহযোগ আন্দোলন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে ঐ দিবাগত রাত সাড়ে বারোটায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবার পর পরদিন ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুকে এই বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পাকিস্তান কারাগারে বন্দি করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি আবারো এই বাড়িতে এসেই ওঠেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট তারিখে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাসী সদস্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের উপস্থিত অন্যান্য সকল সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এক মহানায়কের আদর্শের মূলে এই আঘাত শুধু বাঙালি জাতিকেই নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে করেছে হতবাক।

জল্লাদখানা বধ্যভূমি জাদুঘর

মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর থেকে পল্লবীর দিকে মিনিট দশেক হাঁটলেই বেনারশি পল্লী-এর ভেতরের রাস্তা ধরে আরও কয়েক মিনিট হাঁটলেই, শেষ মাথায় জল্লাদখানা বধ্যভূমি জাদুঘর। কসাইখানা জাদুঘর নামেও এটির বেশ পরিচিতি রয়েছে। এখানে ২০ হাজারের বেশি বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের সময় হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি হানাদার, অবাঙালি বিহারি আর তাদের দোসররা মিলে এই হত্যাকাণ্ড করে। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের ধরে এনে এই জায়গায় হত্যা করা হতো।

এ জাদুঘরের আয়তন খুবই সামান্য। ছোট্ট এই জায়গায়ই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিগুলোকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে চমৎকারভাবে। ভেতরে প্রবেশ করতেই এক টুকরো সবুজ মাঠ স্বাগত জানাবে। এর চারপাশেই স্বচ্ছ কাচের বাক্সর ভেতরে মাটির সরায় সংরক্ষণ করা আছে বিভিন্ন বধ্যভূমির মাটি। একটি ছোটো ঘরের ভেতরে বধ্যভূমির কূপটি স্বচ্ছ কাচে ঘেরা রয়েছে। ছোটো ছোটো ঘরের ভেতরে সংরক্ষিত রয়েছে শহিদদের স্মৃতি সংবলিত বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন।

ঢাকা সেনানিবাস বঙ্গবন্ধু জাদুঘর

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে খুলনায় এক জনসভায় বলেন, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ নামে দুটি পার্টি পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার ষড়যন্ত্র করছে।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকার এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করল, এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে ঐ মামলায় বেকসুর খালাস দিয়ে পুনরায় তাৎক্ষণিকভাবে সামরিক বিধির আওতায় ১৮ জানুয়ারি জেল গেটেই গ্রেফতার করা হয়। আগরতলায় বসে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে এই মামলার নাম দেওয়া হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অপরিহার্য প্রয়োজনে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক সংকটময় সময়ের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত রাখার উদ্দেশে সেনানিবাসের যে ভবনটিতে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেখানেই ঢাকা সেনানিবাস বঙ্গবন্ধু জাদুঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় এই জাদুঘর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এরপর আগরতলা মামলা সংক্রান্ত প্রামাণ্য দলিল, মামলার কার্যবিবরণী, অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের পরিচিতি ও ছবি এবং বন্দি থাকাকালে বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত জিনিসপত্র দিয়ে জাদুঘরটিকে সাজানো হয়।

১৮৩ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৬০ ফুট প্রস্থের আধুনিক স্থাপত্যশৈলীমণ্ডিত জাদুঘরটিতে একজন দর্শক যেসব উল্লেখযোগ্য জিনিস দেখতে পাবেন তার মধ্যে রয়েছে– আগরতলা মামলা ও মুক্তিযুদ্ধের বইপুস্তক সংবলিত একটি লাইব্রেরি, ভবন মডেল, মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী, অভিযুক্তদের ছবি ও মামলার পর্যায়ক্রমিক ছবি, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের পূর্ণ ভাষণ, মামলার চার্জসিটের বিবরণ, সাক্ষীদের পরিচিতি, দলিলপত্রের তালিকা, মামলা চলাকালে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মামলার দৈনন্দিন বিবরণ ও চিত্রসমূহ।

ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে স্টাফ রোডের মোড় থেকে শহীদ সরণি ধরে উত্তর দিকে চারশ গজ এগোলে আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের উলটোদিকে চোখে পড়বে ঢাকা সেনানিবাস বঙ্গবন্ধু জাদুঘর। এর সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু হচ্ছে ভিআইপি রুম যেখানে বঙ্গবন্ধুকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। এই কক্ষটি সেসময়ে যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেভাবেই সংরক্ষণ করা হয়েছে। অন্তরীণ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত কাপড়চোপড়, ধূমপানের পাইপ ও ধূমপান সামগ্রী, খাট ও অন্যান্য আসবাবপত্র, চিত্তবিনোদনের জন্য রেকর্ড প্লেয়ার প্রভৃতি যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেভাবেই রাখা হয়েছে। পাশের আর একটি স্টোর রুমে আগের মতোই রয়েছে চাল, ডাল, তেল, চিনি, চা প্রভৃতি সামগ্রীর বস্তা ও ভাণ্ড। এছাড়া সারা জাদুঘর জুড়ে রয়েছে দেয়ালের উপর প্রান্ত বরাবর সাজানো পিতল খচিত বিভিন্ন ধরনের প্রতীকী ফলক।

বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী একযোগে আক্রমণ চালিয়েছিল ঢাকায় রাজারবাগ পুলিশ লাইনসসহ পিলখানা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসেই বাঙালি পুলিশ সদস্যদের দ্বারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রথম প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। একই সঙ্গে পুলিশ সদস্যরা বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে সারা দেশের থানাগুলোতে ঢাকা আক্রান্ত হওয়ার বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে প্রতিরোধ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে দেশ জুড়ে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে পুলিশ সদস্যদের ওই গৌরবোজ্জ্বল ত্যাগকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ঢাকায় রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই জাদুঘরে সেই স্মৃতিবহ বেতার যন্ত্রটি ছাড়াও স্থান পেয়েছে একটি পাগলা ঘণ্টা, যেটি বাজিয়ে সেই রাতে পুলিশ সদস্যদের একত্রিত করা হয়েছিল, রয়েছে পুলিশ সদস্যদের ব্যবহৃত রাইফেল, বন্দুক, মর্টারশেল, হাতব্যাগ, টুপি, চশমা ও ইউনিফর্ম।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুলিশের মহাপরিদর্শক বেতারে ভাষণ দিয়ে পুলিশ সদস্যদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই জাদুঘরে সেই ভাষণের কপিও রাখা আছে। এছাড়া জাদুঘরের দেয়াল জুড়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক বিভিন্ন ধরনের আলোকচিত্র এবং পোস্টার।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী জাদুঘর

বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সদস্যদের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। ১৯৮৭ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ বিমানবাহিনী জাদুঘর। এতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্ম, মুক্তিযুদ্ধকালে এর ভূমিকা এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিমানবাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রম ও আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যবহৃত বিমান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে সংযোজিত বিভিন্ন ধরণের বিমান ও সাজ-সরঞ্জাম প্রদর্শনীর জন্য বাংলাদেশ বিমানবাহিনী জাদুঘর স্থাপিত হয়। জাদুঘরে রাখা বিমানগুলো বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে।

এছাড়া জাদুঘরে উপস্থাপিত ম্যুরাল চিত্রে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি ভারতীয় মিত্রবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত তিনটি জঙ্গি বিমান ও কিছু স্মারক গোলাবারুদ

বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সামরিক জাদুঘর

সম্প্রতি ভারতীয় বিমানবাহিনী বাংলাদেশ বিমানবাহিনী জাদুঘরকে হস্তান্তর করেছে। এই জঙ্গি বিমানগুলো মিত্রবাহিনী কর্তৃক হানাদার বিমান আক্রমণকে প্রতিহত এবং ভূপাতিত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই তিনটি জঙ্গি বিমানের সফল ভূমিকার কারণে এদের জাদুঘরে ঘরে অন্তর্ভুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এ জাদুঘরে প্রদর্শিত ঐতিহাসিক আলোকচিত্রর মধ্যে রয়েছে– স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যবহৃত কানাডায় নির্মিত একটি অট অটার বিমান, স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যবহৃত ফ্রান্সের তৈরি একটি এলুয়েট হেলিকপ্টারসহ বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু হেলিকপ্টার, প্রশিক্ষণ বিমান, জঙ্গি বিমান এবং গোলাবারুদ।

বাংলাদেশ রাইফেলস জাদুঘর

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ভূমিকা ও অবদান স্মৃতিতে ধরে রাখার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে ঢাকার পিলখানায় বাংলাদেশ রাইফেলস-এর জাদুঘরটি স্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠের জীবনবৃত্তান্ত ও ছবি, প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক পটভূমিসহ শাসকদের ছবি, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের ছবি, ভাষা আন্দোলনে শহিদদের ছবি, ব্রিটিশ রৌপ্য মুদ্রা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নানা নিদর্শন এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচারের বিভিন্ন ছবি ও তথ্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাণাঙ্গনে নেতৃত্বদানকারী সেক্টর কমান্ডারদের নামসহ এলাকার নকশা ইত্যাদি রাইফেলস জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

কালের বিবর্তনে ৭ বার পরিবর্তিত বাংলাদেশ রাইফেলসের পোশাকে সজ্জিত ৭টি ভাস্কর্য জাদুঘরে উপস্থাপিত আছে যা বাংলাদেশ রাইফেলস-এর দু'শত বৎসরের ঐতিহ্যের নিদর্শন বহন করছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ডাকটিকেটসহ বিভিন্ন দেশের স্মারক ডাকটিকেট, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রকাশিত পুস্তক সংরক্ষিত আছে এবং বর্তমান বিডিআর-এর কার্যক্রমের উপর বেশ কিছু ছবি ও স্যুভিনির রয়েছে।

সামরিক জাদুঘর

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিকবাহিনীর রয়েছে বিশাল অবদান। আবহমান বাংলার চিরাচরিত সামগ্রিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এ দেশের সামরিকবাহিনীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাফল্য আর উন্নয়নের ক্রমবিকাশ সংরক্ষণ ও প্রচার করার জন্য ১৯৮৭ সালে ঢাকার মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে স্থাপিত হয় বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর। জাদুঘরটি ১৯৯৮ সালে নগরের গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রস্থল বিজয় সরণিতে স্থানান্তরিত করা হয়। জাদুঘরটি পরিদর্শন করলে জানতে পারা যাবে এ দেশের সামরিক ঐতিহ্যকে, সেই সাথে জানা যাবে মুক্তিযুদ্ধের নানা নিদর্শন সম্পর্কে।

সামরিক জাদুঘর ভবনের নিচতলায় রয়েছে অত্যাধুনিক টাচস্ক্রিন কম্পিউটার, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত চলচ্চিত্র সহজেই দেখা যাবে। দ্বিতল ভবনের নিচতলায় রয়েছে ঐতিহাসিক যুদ্ধাস্ত্র ও বিভিন্ন সমরযান। রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানির ব্যবহৃত গাড়ি, স্বাধীনতাযুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানিবাহিনীর ব্যবহৃত কামান ও বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধযান। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডারদের তৈলচিত্র দেখতে পাওয়া যাবে 'মুক্তিযুদ্ধ' নামক গ্যালারিতে। এ গ্যালারিতে আরও রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলের অনুলিপি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের মুহূর্তটি একটি বিশাল তৈলচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। রয়েছে বীরশ্রেষ্ঠদের তৈলচিত্র। তাঁদের বীরত্বগাথা উঠে এসেছে ছবিগুলোয়। সামরিক জাদুঘরের দোতলায় একটি পাঠাগারও রয়েছে। এটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আর সহায়ক রকমারি বইয়ে ঠাঁসা। যে কেউ এটি ব্যবহার করতে পারেন।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

লিট ফেস্ট

বাংলার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের মেলবন্ধন

নাজমা ইসলাম

১৬ নভেম্বর ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শুরু হয় সপ্তম ঢাকা লিট ফেস্ট। লিট ফেস্ট– আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, শব্দের শক্তিকে উদ্‌যাপন করা, শব্দের শক্তিকে পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে তা লেখক, পাঠক ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে উপলব্ধি করা।

বাংলা ভাষা বিশ্বের সপ্তম ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। বহুসংখ্যক মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। এই বাংলা ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্বকে জানাতে হবে, জানতে হবে বিশ্ব সাহিত্য– এই লক্ষ্যেই আন্তর্জাতিকভাবে আয়োজিত এই পাঠক, লেখক বুদ্ধিজীবী সমাবেশ। মূলত বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের লেখক-পাঠকদের দূরত্ব ঘোচাতেই এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব– সপ্তম ঢাকা লিট ফেস্ট।

তিনদিনের এই লিট ফেস্টের প্রথম দিনের সকাল থেকেই বাংলা একাডেমির সবুজ প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে লেখক-পাঠক আগমনে। নানা দেশের বহু সংখ্যক লেখক এসেছেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশের পাঠক, বুদ্ধিজীবী, লেখকদের সঙ্গে নানা আলোচনায় উৎসবের নির্ধারিত বক্তৃতায় অংশ নিয়েছেন তাঁরা। প্রথম দিনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য-বিজ্ঞান-রাজনীতিসহ নানা বিষয়ের ৩১টি অধিবেশন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করেছে 'যাত্রিক'।

অধিবেশনের প্রথম দিনের বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে দেশি-বিদেশি খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পানুরাগীদের সরব পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠেছিল বাংলা একাডেমি চত্বর। দু'শতাধিক দেশি-বিদেশি কবি সাহিত্যিকের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে সকালে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে আরবি ভাষার বিখ্যাত কবি সিরিয়ার অ্যাডোনিস তিনদিনব্যাপী 'ঢাকা লিট ফেস্ট'-এর উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন। তিনি আরবি, ফরাসি ও ইংরেজিতে উৎসবের উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা লিট ফেস্ট- এর সহআয়োজক বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, বঙ্গবন্ধুর নাতি রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, লিট ফেস্টের পরিচালক সাদাক সাম আহসান আকবর ও কাজী আনিম আহমেদ। সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

লিট ফেস্টের উদ্‌বোধনি মঞ্চে সিরিয়ার কবি অ্যাডোলিস ইংরেজিতে অনূদিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক গ্রাফিক নভেল *মুজিব* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে শামসুজ্জামান খান বলেন, আমাদের বাংলা ভাষার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। বাঙালি জাতি তার মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছে। লিট ফেস্টের এ বছরের থিম 'বাধাকে না বলা' উল্লেখ করে পরিচালক সাদাক সাম জানান, এ বছর লিট ফেস্টে তারা দক্ষিণ এশিয়ার ইংরেজি সাহিত্যের সম্মানজনক ডিক্রমমি প্রাইজ ঘোষণা করেছেন। অনুষ্ঠান শুরুর দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে সকাল ৯টাতেই সুরের মূর্ছনায় শুরু হয় লিট ফেস্টের আনুষ্ঠানিকতা। গায়িকা নেদা সাকিবার সুরের লহর দিয়ে স্বাগত জানানো হয় সপ্তমবারের আসরের সাহিত্যানুরাগীদের। নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নাতি রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি বলেন, সকল শ্রেণির পাঠকের কথা চিন্তা করেই গ্রাফিক নভেল *মুজিব* বইটি বাংলা ও ইংরেজিতে তৈরি করা হয়েছে। ইংরেজিতে বইটির ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় উভয় শ্রেণির পাঠকের কথা ভাবা হয়েছে। এদিকে সকালে কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় 'দ্য শর্ট অব ইট' শীর্ষক আলোচনা।

৪ জন পেলেন জেমকন সাহিত্য পুরস্কার

প্রথম দিনের অধিবেশনের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল জেমকন সাহিত্য পুরস্কার। তিন ক্যাটাগরিতে ৪ জন পেলেন এই পুরস্কার। জেমকন সাহিত্য পুরস্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ দুটি গাথা কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি মোহাম্মদ রফিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৮ লাখ টাকার চেক। একই সঙ্গে তরুণ কথাসাহিত্যিক শাখায় গদ্যের পাণ্ডুলিপির জন্য আশরাফ জুয়েল, মামুন অর রশীদ এবং কবিতা শাখায় নুসরাত নুসিনের হাতে পুরস্কার ও নগদ অর্থমূল্য তুলে দেওয়া হয়। দিন শেষের আকর্ষণ ছিল শেরিক আল সায়ারের সঞ্চালনায় রোহিঙ্গা ও মানবতা শীর্ষক আলোচনা। এতে অংশ নেন বখতিয়ারউদ্দিন চৌধুরী, সম্পদ বড়ুয়া, হারুন উর রশীদ ও তপোধীর ভট্টাচার্য। উৎসবের আরেক মঞ্চ কসমিক টেন্টে হয়েছে 'বাংলা নারী দুর্জয় ঘাটি' শীর্ষক সেশন। বিকেলে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মঞ্চে এক শিরোনামের আলোচনায় অংশ নেন ডেভিড হেয়ার, ইরেশ যাকের ও বিশিষ্ট অভিনেতা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। সারা দিনে শিশুদের জন্যও ছিল বেশ কয়েকটি সেশন। শিশুদের জন্য কবিতা পড়েন খালেক বিন জয়েনউদ্দিন, আসলাম সানিসহ

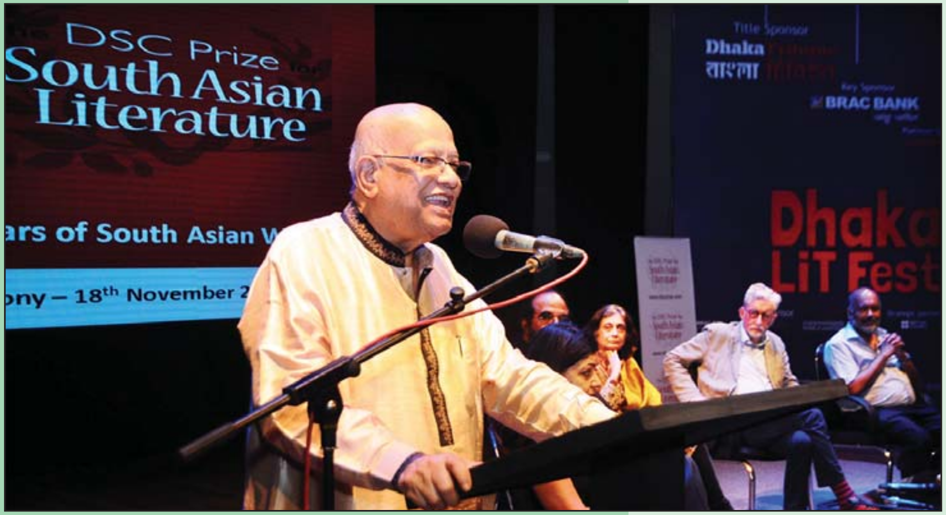

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৮ নভেম্বর ২০১৭ বাংলা একাডেমিতে South Asian Literature Certificate Giving Ceremony অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন -পিআইডি

অন্যান্য কবিগণ। ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা ছিল প্রথম দিনের শেষ আয়োজন।

দ্বিতীয় দিন

কীর্তনের সুর দিয়ে শুরু হয় লিট ফেস্টের দ্বিতীয় দিনের আসর। লিট ফেস্টের দ্বিতীয় দিনে বাংলা একাডেমি সবুজ চত্বর যেন পরিণত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়। গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র, কবিতা ও কথাসাহিত্যের নানা ক্ষেত্র নিয়ে চলা সেশনের পাশাপাশি নাচ, গান এবং ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলাও উপভোগ করেন দর্শনার্থীরা। বই ক্রেতার সংখ্যাও ছিল চোখে পড়ার মতো। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে শুরু হয় স্কটিশ ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক উইলিয়াম ডালরিম্পলের সেশন। ডালরিম্পল তাঁর ভ্রমণকাহিনি থেকে পড়ে শোনান ও আলোচনায় অংশ নেন। তিনি অনুষ্ঠানে জানান, খুব শীঘ্র আসছে তাঁর রচিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস নিয়ে একটি বই। সেখানে থাকছে বাংলাদেশ নিয়ে একটি অধ্যায়।

বিকেলে লনের মঞ্চে আরবিতে কবিতা পড়েন সিরিয়ার কবি অ্যাডোনিম। লনে তখন পাঠক-দর্শকের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। জেরুজালেম নিয়ে রচিত কাব্যগ্রন্থ *আল কুদস* থেকে দুটি কবিতা পড়েন তিনি। বুকার জয়ী নাইজেরিয়ান সাহিত্যিক বেন ওক্রির বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্যা ফ্যামিশন রোড' নিয়ে একটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে লেখক নিজে তাঁর উপন্যাস থেকে পড়ে শোনান ও পাঠকের প্রশ্নের জবাব দেন।

'পৃথিবীটা ফুল হলে
কবিতা তার সৌরভ'

- আরব কবি অ্যাডোনিস

'পৃথিবীটা যদি ফুল হয় কবিতা হবে তার সৌরভ' বলেছেন লিট ফেস্টে যোগদানকারী বিশিষ্ট আরব কবি অ্যাডোনিস। কবি তাঁর কবিতায় আরব ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে সময়ের কথা বলেন। আরবি ভাষায় প্রথম সনেট রচনাকারীও তিনি। কবিতায় মানুষ, সাম্য, ফুল, সৌরভ ও সময়ের কথা বলেন। কবিতাকে তিনি ফুলের সৌরভের সঙ্গে তুলনা করেন। অন্যদিকে তিনি কবিতাকে 'জননী' বলেও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন– 'আমার মা দুজন। প্রথমজন আমার জন্মদাত্রী আর দ্বিতীয়টি হলো কবিতা।'

দুই বাংলার সম্পর্ক নিয়ে 'সম্পর্কের এপার ওপার' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন। বিভাস রায় চৌধুরী, শামসুজ্জামান খান, শাহীন আক্তার প্রমুখ। বক্তাদের কথায় ওঠে আসে ভৌগোলিক সীমারেখা কখনোই দুই বাংলার সম্পর্ককে ভাগ করতে পারবে না। 'অক্ষর ও বিজ্ঞান' নিয়ে আলোচনা হয় শামসুর রাহমান মিলনায়তনে। এতে অংশ নেন গবেষক গর্গ চট্টোপাধ্যায় ও কবি মৌসুমী ব্যানার্জি।

উৎসবে নারীদের বহুল আলোচিত 'হ্যাশট্যাগ ক্যাম্পেইন, মিটু' নিয়ে ছিল একটি সেশন। ভারতীয় সাংবাদিক জ্যোতি মালহোত্রার সঞ্চালনায় এই সেশনে অংশ নেন বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা সামিয়া জামান। 'ইনট্যানজিবেল' নিয়ে আলোচনা করেন- নাট্য নির্দেশক জামিল আহমেদ, অনন্যা কবির ও সুপ্রভা। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল ঐতিহ্যবাহী জামদানি, বাউল গান বা মঙ্গল শোভাযাত্রা। রিফাত মুনিমের উপস্থাপনায় 'টেম্পোরারি পিপল' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন– দীপক উন্নি কৃষান এবং আন্দ্রে নাফিস সাহেলি। আলোচক দু'জনই অভিবাসন ও পরবাস জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। কথাসাহিত্যিক পারভেজ হোসেনের সঞ্চালনায় বিশেষ সেশন 'রূপকথা ও পুরনো কথা যখন নতুন করে ফিরে আসে' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন– আনিসুল হক, মইনুল আহসান সাবের, ফারিহা হোসেন ও জহরসেন মজুমদার। বক্তারা বলেন– যখন লেখকের পক্ষে সরাসরি বাস্তব ঘটনার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব না হয়, তখন রূপকথাই আশ্রয় হয়ে ওঠে।

উৎসব প্রাঙ্গণে এসেছিলেন চলচ্চিত্রের সেলিব্রেটিরা– চিত্রনায়ক রিয়াজ ও হুমায়ূন পত্নী মেহের আফরোজ শাওনকে ঘিরে ছিল উৎসুক দর্শক। তাঁরা এসেছিলেন চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আলোচনা করতে। এ সেশনে অংশ নেন– চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রগ্রাহক মাহফুজুর রহমান খান। দিন শেষে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল চৌধুরীর কবি জীবন নিয়ে আলোচনা করেন– কবি ও শিক্ষক শামিম রেজা।

কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক শিশুদের আয়োজনে শোনান– 'সাত ভাই চম্পার' গল্প। সকালে কসমিক টেন্টে শুরু হয় নাজিয়া জাবিনের গল্প বলার আসর। বটতলায় প্রদর্শিত হয় সুকুমার রায়ের নাটক। দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্নে রোকেয়া সুলতানার ইলাস্ট্রেশনে ২১ দিগ্বিজয়ী নারীর গল্পগাঁথা নিয়ে রচিত হয়েছে *হার স্টোরিজ* বইটি। অধিবেশনটি উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিউতি সবুর। বাংলাদেশের লড়াকু ও প্রতিষ্ঠিত নারীরা এতে অংশ নেন। বক্তা হিসেবে ছিলেন, সাউথ এশিয়ান গেমসে সোনা বিজয়ী মারিয়া আক্তার। এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার, স্কলাস্টিকার এমডি মাদিহা মোর্শেদ, প্রথম কমব্যাট পাইলট নাইমা হক ও তামান্না ই-লুৎফি। আলোচনায় বক্তারা নিজেদের অনুপ্রেরণা ও সাফল্যের গল্প বলেন। সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

বাংলা শিখেছি বললেন ভারতের লেখক জেরি পিন্টো

ভারতের মুম্বাইয়ে বসবাসকারী লেখক জেরি পিন্টো উৎসবে যোগ দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমি একটু একটু করে বাংলা শিখেছি এবং বাংলা সাহিত্যকে জানতে অনুবাদের বই পড়েছি। নিজের লেখক সত্তা নিয়ে বলতে গিয়ে জেরি পিন্টা বলেন, একজন লেখকের অবশ্যই সমাজ সচেতন হতে হবে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ছাড়া ভালো লেখক হওয়া যায় না।

অস্কার বিজয়ী টিলডার পূর্বপুরুষ ছিলেন ঢাকায়

অস্কার বিজয়ী ইংল্যান্ডের অভিনেত্রী ক্যাথরিন মালিন্ডা সুইন্টন উৎসবে যোগ দেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ হলে চলা এক অধিবেশনে অভিনেত্রী তাঁর অভিনয় জীবনের চেয়ে লেখক জীবন নিয়েই বেশি কথা বলেন। দীর্ঘ ৩২ বছর তিনি লেখালেখি থেকে দূরে থেকেছেন। এ নিয়ে এই লেখিকা ও অভিনেত্রী আফসোস করেন। তিনি জানান, তিনিই প্রথম নন যিনি বাংলাদেশে এসেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষ আর্চবিল সুইন্টন ঢাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাপটেন ছিলেন। টিলডা ১৯৯৭ সালে হলিউডে কাজ শুরু করেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র 'দ্য বিচ'।

তৃতীয় দিনে সাহিত্যপ্রেমীদের মিলনমেলা ভাঙল

সাহিত্যে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার ডিএসসি পুরস্কার প্রদান, ব্রিটিশ ও সাহিত্য জার্নাল *দ্য গ্রান্টার* এর মোড়ক উন্মোচন একই সঙ্গে আড্ডা আর আলোচনার মধ্য দিয়ে একাডেমিতে আয়োজিত তিন দিনের আন্তর্জাতিক সাহিত্য আসর 'ঢাকা লিট ফেস্ট ২০১৭' শেষ হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের দিকপালেরা তিনদিন জমিয়ে রেখেছিলেন সাহিত্যপ্রেমীদের। লিট ফেস্ট জমিয়ে রেখেছিলেন বিশ্বের ২৪টি দেশের দুই শতাধিক কবি-সাহিত্যিক-চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ও শিল্পবোদ্ধারা। ম্যানবুকার জয়ী সাহিত্যিক থেকে শুরু করে অস্কার জয়ী অভিনয় শিল্পীরাও ছিলেন এই উৎসবে। উৎসবে বরেণ্য সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানান।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক

ঔষধ শিল্পের আদি কথা

নাজনীন সুলতানা নীতি

একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি গুণে উন্নত ও ক্রমপরিশীলিত ওষুধ প্রস্তুত ও এ সংক্রান্ত বিষয়াদি (ফার্মাসিউটিক্যাল) মূলত উনবিংশ শতকের ঔষধ প্রস্তুতবিদ্যা বা ফার্মেসি থেকে উদ্ভূত। সেখান থেকে এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে বর্তমান বিশ্বে ফার্মাসিউটিক্যাল খাতটি তার সর্বাধুনিক রূপে আবির্ভূত হয়েছে ।

ঔষধ প্রস্তুত বা ঔষধ শিল্পের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই শিল্পের মূল নিহিত রয়েছে মধ্যযুগে। যখন ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা এবং দাওয়াখানাগুলো রোগ আরোগ্যে প্রথাগত অর্থাৎ সনাতন প্রতিষেধক প্রদান করত। সেসব প্রতিষেধক বহু শতাব্দীব্যাপী প্রচলিত লোকজ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরি করা হতো, যদিও তা প্রায়শই মানুষকে ভুল চিকিৎসার শিকার করত।

তবে ঔষধ শিল্প বলতে আমরা আজ যা বুঝি, তার উৎপত্তি হয়েছে মূলত উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মাধ্যমে যুক্তিবাদী ও গবেষণামূলক ধ্যানধারণার প্রসার হয়েছিল এবং শিল্পবিপ্লব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে রূপান্তরের এক ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু মানব স্বাস্থ্যের উন্নয়নে এই দুটি ধারণার সম্মিলন তুলনামূলকভাবে দেরিতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে জার্মানির মার্খ কোম্পানিটি প্রথম ভূমিকা নিয়েছিল ১৬৬৮ সালে ড্রামস্টাডে একটি ফার্মেসি কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে। ১৮২৭ সালে কোম্পানি প্রধান হেমরিখ ইমানুয়েল মার্খ অলকালয়েডস (অম্লযুক্ত ঔষধ) উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানিকে শিল্প ও বিজ্ঞানমুখী যাত্রাপথে উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন।

একইভাবে, গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইনের উৎপত্তি হয়েছিল সেই ১৭১৫ সালে। আর মাত্র উনিশ শতকের মধ্যভাগে আসার পর বীচ্যাম কোম্পানির ঔষধের শিল্পভিত্তিক উৎপাদন এবং ১৮৪২ সালে নিবন্ধিত ঔষধের উৎপাদন শুরু করেছিল। ১৮৫৯ সালে এই কোম্পানিটি বিশ্বে নিজেকে একক এবং শুধুমাত্র ঔষধ প্রস্তুতকারক একটি কোম্পানি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এসময় আমেরিকাতে দুই জার্মান অভিবাসী ফিজার নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করেন মূলত রাসায়নিকের ব্যবসা করার জন্য। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ চলাকালীন খুব দ্রুত তাঁদের ব্যবসার ব্যাপক প্রসার ঘটে। কারণ, গৃহযুদ্ধের সময় পেইনকিলার এবং এন্টিসেপটিকের চাহিদা রকেটের গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এদিকে ফিজারের ব্যবসায়িক সাফল্য যখন ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হচ্ছিল তখন আমেরিকান সেনাবাহিনীতে কলোনেল ইলি লিলি নামে একজন সেনা কমান্ডার ছিলেন। সেই সঙ্গে একজন প্রশিক্ষিত ঔষধ প্রস্তুত সংক্রান্ত রসায়নবিদও ছিলেন। উনিশ শতকের সক্রিয় এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আমেরিকান শিল্পপতিদের মধ্যে তাঁকে আদর্শ বলা চলে। ১৮৭৬ সালে কলোনেল লিলি তাঁর সামরিক পেশাজীবন সমাপ্তির পর ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিল্পক্ষেত্রে নিত্য নতুন ধারণার ব্যবহারের জন্য তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। উৎপাদনের পাশাপাশি গবেষণা এবং উন্নয়নের (আর অ্যান্ড ডি) প্রতিও পূর্ণাঙ্গ মনোযোগী ছিলেন যা তাঁর সময়ে কদাচিৎই কেউ করতেন।

এডওয়ার্ড রবিনসন স্কুইব নামে আরেকজন সামরিক ব্যক্তি ঔষধ ব্যবসা করতেন। তিনি ১৮৪৬-১৮৪৮ সালে মেক্সিকো-আমেরিকা যুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর চিকিৎসক ছিলেন। সে সময় তাঁকে জাহাজে করে সরবরাহ করা ঔষধ নিম্নমানের কারণে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ১৮৫৮ সালে ফিজারের মতো তিনি ঔষধ সরবরাহের জন্য একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সুইজারল্যান্ডেও স্থানীয় আকারে ঔষধ শিল্প গড়ে উঠেছিল। এর আগে সুইজারল্যান্ড বস্ত্র ও রঞ্জক পদার্থের বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত ছিল। সেখানে এ সংক্রান্ত উৎপাদক ব্যক্তিবর্গ ক্রমেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, রঞ্জক পদার্থে এন্টিসেপটিক এবং অন্যান্য উপাদান রয়েছে। সুতরাং তারা এসব উপাদান ফার্মাসিউটিক্যালরূপে বিক্রি করতে শুরু করলেন। সেসময় আরো অনেক শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিই তাদের ব্যবসা ঔষধ প্রস্তুত শিল্পে রূপান্তরিত করেছিলেন।

রঞ্জক পদার্থের ব্যবসা থেকে ঔষধের ব্যবসায় এসেছে এমনটি শুধু সুইস কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রেই ঘটেনি। কার্ল মার্কসের প্রাণপ্রিয় বন্ধু ও সহযোগী ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের নিজ শহর উপ্পারটাল-এ রঞ্জক প্রস্তুতকারক হিসেবে ১৮৬৩ সালে বেয়ার কোম্পানি গড়ে উঠেছিল। শীঘ্রই এটি ঔষধের ব্যবসায় চলে আসে এবং বিশ শতকের দিকে এসপিরিনের বাজারজাতকরণ শুরু করে। সেসময় এটি সর্বাধিক বিক্রিত একটি ঔষধ ছিল।

বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ঔষধ ব্যবসার এই অনিয়ন্ত্রিত রূপটি এটাই প্রমাণ করে যে, এখনকার মতো সেসময় 'ঔষধ' এবং 'রাসায়নিক' এই দুই শিল্পের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না বললেই চলে। এসব কোম্পানি একদিকে যেমনি কড লিভার ওয়েল, টুথপেস্ট, কোমল পানীয়ের জন্য সাইট্রিক এসিড, চুলের ঔষধ হিসেবে হেয়ার জেল বিক্রি করত অন্যদিকে তেমনি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া হেরোইনের মতো পণ্যও দেদারসে বিক্রি করত।

তখনকার জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংঘর্ষের এই উন্নয়নশীল শিল্পটিকে কম প্রভাবিত করেনি। বেয়ার কোম্পানির এসপিরিনের বাণিজ্যস্বত্ব ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বেয়ারের বাণিজ্যস্বত্ব এবং এর আমেরিকায়

অবস্থিত সব সম্পত্তি জব্দ করে নেওয়া হয়। আবার আমেরিকান 'মার্ক' কোম্পানি (এখন আমেরিকায় মার্ক অ্যান্ড কো বা মার্ক শার্প অ্যান্ড ডোহম্ রূপে পরিচিত)কে জার্মানিতে এর মূল কোম্পানি থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। রুশ বিপ্লবের সময় রাশিয়ায় বেয়ার কোম্পানির অধীন ছোটো কোম্পানিগুলোও জব্দ করে নেওয়া হয়। বিশ শতকের শুরুর দিকে যুদ্ধের কারণে ঔষধ শিল্পে জার্মানির নেতৃস্থানীয় অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেলে অন্যান্য শক্তি বিশেষ করে আমেরিকার জন্য এ শিল্পের সম্ভাবনাময় বাজার দখলের সুযোগ তৈরি হয়।

ঔষধ শিল্পে বিশ্বায়নের সূচনা যুদ্ধের পূর্বে এবং পরবর্তীতে লক্ষ করা গিয়েছিল যুক্তরাজ্যে। যুদ্ধ পরবর্তী বছরগুলোতে যুক্তরাজ্যে ওয়েইথ, স্যান্ডোজ, সিআইবিএ, ইলি লিলি, এমএসডির মতো বড়ো বড়ো বিদেশি ঔষধ কোম্পানিকে নিজেদের অধীনস্থ নতুন কোম্পানি গড়ে তোলায় উৎসাহ প্রদানে আমদানি শুল্ক ছাড়সহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল।

১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে দুটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল, যা আজ আমরা ঔষধ শিল্পের যে রূপ দেখতে পাচ্ছি তার গড়ে ওঠার পূর্বলক্ষণ ছিল। এর মধ্যে প্রথমটি ইনসুলিনের উদ্ভাবন। ফ্রেডরিক ব্যান্টিং এবং তাঁর সহকর্মীগণ প্রথম ডায়াবেটিস তথা বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ইনসুলিন বিযুক্ত করেন। যদিও ইলি লিলি কোম্পানির বিজ্ঞানীরাই প্রথম পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিশোধিত ইনসুলিন প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর তারাই একে কার্যকর ঔষধ হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করেছিলেন।

দ্বিতীয়টি ছিল পেনিসিলিন; যা অন্য যে-কোনো ঔষধের চেয়ে অতুলনীয় এক আবিষ্কার ছিল। ১৯২৮ সালে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং কর্তৃক পেনিসিলিয়াম মোল্ড থেকে এন্টিবায়োটিকের আবিষ্কার এবং হাওয়ার্ড ফ্লোরে ও আর্নস্ট চেইনসের এ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষণের পর সরকারি সহযোগিতায়, আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত হয়ে মার্ক, ফিজার এবং স্কুইব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এই ঔষধের ব্যাপক উৎপাদন নিয়ে কাজ করেছিল, যা সেসময় হাজারো সৈন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। ব্যাপক পরিমাণ পরিশুদ্ধ পেনিসিলিনের আবির্ভাব ঔষধের উন্নয়নে, ঔষধ শিল্পে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সেই সঙ্গে ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার এবং কোম্পানিকে পারস্পরিক সহযোগিতায় সব ধরনের ঔষধ নিয়ে অধিক গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করে তোলে, হোক সেটি কোনো নতুন বেদনানাশক ঔষধ কিংবা নিতান্ত জ্বর ও ফুসকুড়ি ভালো করার পথ্য।

যুদ্ধের পর ইউরোপে যুক্তরাজ্যের ইউকে'স ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)-এর মতো সামাজিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি শুরু হয় যা একটি শুভ সূচনা ছিল। কেননা এতে ঔষধের প্রেসক্রিপশন আর খরচ উভয় বিষয় একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে চলে আসে। ১৯৫৭ সালে এনএইচএস ঔষধের জন্য প্রকৃত অর্থে একটি মূল্য নির্ধারণ পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল যাতে ঔষধ উৎপাদকগণ সুদে-আসলে তাদের বিনিয়োগ খরচ ফিরে পান।

এদিকে যুদ্ধ পরবর্তী আমেরিকার ঔষধ শিল্প ক্রমশ ফুলে উঠছিল এবং খুব শীঘ্রই বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে গতিশীল অর্থনীতির অংশ হয়ে ওঠে। এই উত্তরণ সরকার ও জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোর সম্মিলিতভাবে উদার অনুদানের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫৬ সাল নাগাদ এই অনুদানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার। তৎকালে এই বিনিয়োগ আসন্ন দশকগুলোতে ঔষধের উন্নয়নকে অনেকখানি তরান্বিত করেছিল। সেই সঙ্গে এই খাতে ব্যবসার একটি নৈতিক ভিত্তিও তৈরি হয়েছিল। ১৯৫০ সালে জর্জ মার্ক স্বাস্থ্য খাতে ব্যবসার নৈতিকতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমরা এটা কখনোই ভুলার চেষ্টা করি না যে, ঔষধের উদ্দেশ্য জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জন নয়। মুনাফা আসবেই এবং যদি আমাদের স্মরণে থাকে তাহলে দেখব, এর আসা কখনোই থেমে থাকেনি। এটা আমরা যত ভালো মনে রাখতে পারব ততই এর পরিধি বৃদ্ধি পাবে'।

তখন পর্যন্ত জনকল্যাণমূলক এই শিল্পের প্রতি যথেষ্ট যত্ন ও সজাগ পর্যবেক্ষণ বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল। যদিও আটলান্টিকের দুই পাড়েই সরকার কর্তৃক ঔষধ সংক্রান্ত নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল।

১৯৬১ সালে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার পর ঔষধের নীতিতে কিছু আবশ্যক পরিবর্তন আনা এবং যে-কোনো ঔষধ নিবন্ধনের পূর্বে পরীক্ষা করার বাধ্যবাধকতা আসে। ১৯৬২ সালে নতুন যে-কোনো ঔষধের কার্যকারিতার প্রমাণ প্রদর্শন এবং সঠিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার তথ্য অবমুক্ত করার নিয়ম আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন-এর বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেফভার হ্যারিস এমেন্ডমেন্ট নামে। একইভাবে ১৯৬৪ সালে হেলসিংকি ঘোষণার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে প্রস্তুত ঔষধ এবং অন্যান্য রাসায়নিকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার জন্য নৈতিকতার কঠোর মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়।

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় অসাধারণ অভিনব সব ঔষধের উদ্ভাবন এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিল। এর মধ্যে ১৯৬০ সালে নারীদের জন্য জন্মনিরোধক ঔষধের প্রচলন শুরু হলে তার প্রভাবের ব্যাপকতা ছিল পেনিসিলিনের সমতুল্য। ১৯৬৩ সালে রসে কোম্পানি মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতার চিকিৎসায় ভ্যালিয়াম ও মনোয়ামিন অক্সিডাস ইনহিবিটর নিয়ে আসে। এই ঔষধদ্বয় মানসিক চিকিৎসায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। ১৯৭০- এর দশকে আমেরিকা সরকারের ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর বহুবিধ ক্যানসারের ঔষধ বাজারে আনা হয়। যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, সত্তর দশকের গোড়ায় টিউমার সংক্রান্ত ব্যাপক গবেষণা শুরুর দরুণ ক্যানসার রোগে আরোগ্যের হার দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে হৃদরোগের চিকিৎসায় এসিই ইনহিবিটর (উচ্চ রক্তচাপ বা এ ধরনের রোগে হৃদযন্ত্রের ধমনী প্রসারক) বাজারে আনা হয়। আর প্যারাসিটামল এবং আইবুপ্রোফেনের মতো সর্বব্যাপী ঔষধগুলো ১৯৫৬ এবং ১৯৬৯ সালে তার পূর্ণ বাজাররূপ পেয়েছিল।

সত্তরের দশকের শেষ দিকে ঔষধ শিল্পের অগ্রযাত্রায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হলো আলসার রোগের ঔষধ উদ্ভাবনের মাধ্যমে। ১৯৭৭ সালে আলসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'টাগামেট' প্রথম ঔষধ ছিল যেটি এক বছরে এক বিলিয়ন ডলায় আয় করেছিল এবং এর উদ্ভাবকদের নোবেল পুরুস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল। বিস্ময়কর এই আবিষ্কার বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকি বেশ কিছু কোম্পানি পরবর্তী আরেকটি যুগান্তকারী উদ্ভাবনের কৃতিত্বের দাবিদার হওয়ার তাড়নায় নিজেদের মধ্যেই ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

সফলতার পাশাপাশি নানা ব্যর্থতা ও বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও একবিংশ শতাব্দীতে এসে কম্পিউটিং এবং জীবপ্রযুক্তির উত্তরোত্তর উন্নয়নের সুযোগে ঔষধ শিল্পে নিত্যনতুন ঔষধের উদ্ভাবন এবং উৎপাদন, অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে যা পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সত্তরের দশকে ইনসুলিনের আবির্ভাব থেকে শুরু করে জিন পরিবর্তন প্রযুক্তির মাধ্যমে আজ ব্যাকটেরিয়া থেকেও মানুষের জন্য উপযোগী প্রোটিন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। সহস্রাব্দের সূচনায় মনোক্লোনিক্যাল এন্টিবডিসের (ক্লোনকৃত সমধর্মী কোষ থেকে ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত অভিন্ন এন্টিবডি) মতো বায়োলজিক্যাল ড্রাগের সূত্রপাত অদূর ভবিষ্যতে অধিকতর বিশেষায়িত ঔষধের জন্য সম্ভাবনার এক বিশাল দুয়ার খুলে দিয়েছে, যা মানব স্বাস্থ্যকে ততটাই ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে কিংবা তার চেয়েও বেশি, যতটা বিগত শতাব্দীতে সিনথেটিক ঔষধের মাধ্যমে হয়েছিল।

লেখক: এমফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

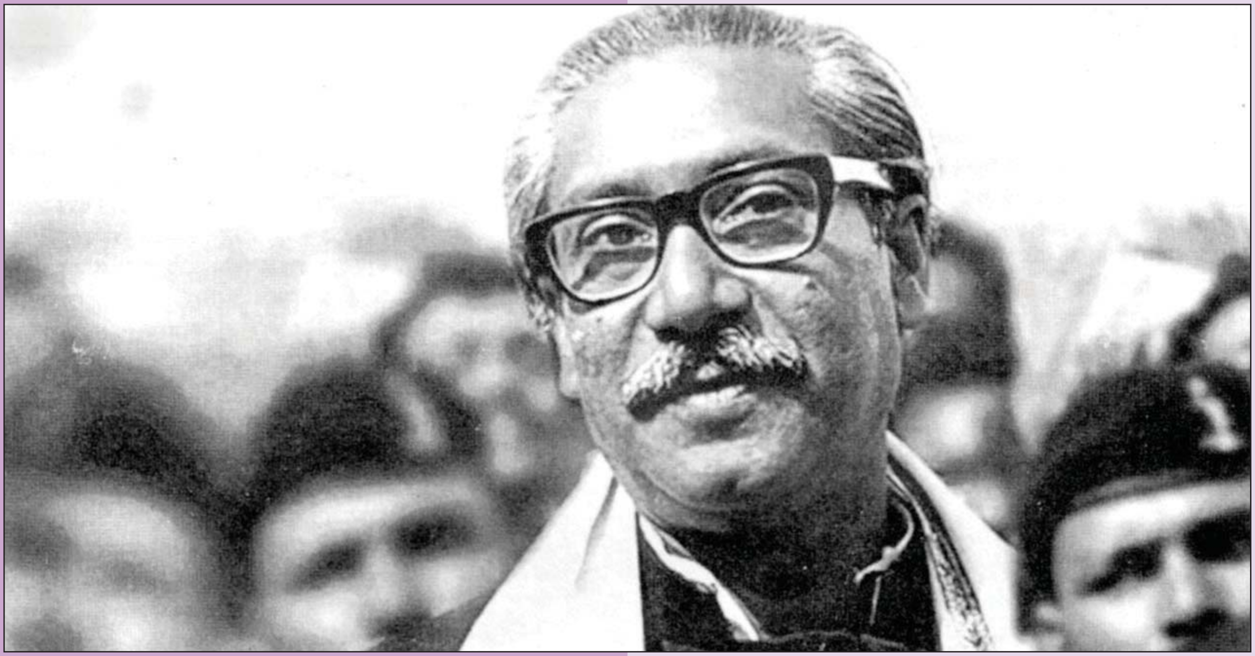

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা

কমল চৌধুরী

বিশ্বের মানচিত্রে কোনো জাতি একদিনে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করেনি। বাংলাদেশও একদিনে স্বাধীনতা লাভ করেনি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হলেও মূলত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার উদ্ভব হয়েছে। প্রতিটি জাতির একজন পিতা থাকে। বাংলাদেশের তথা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলনের পূর্বে ১৯৪৬ সালেই বঙ্গবন্ধু প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন। তারপর ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা, '৭০ এর নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু প্রতিটি আন্দোলনের সাথেই সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাই বঙ্গবন্ধু-মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চট্টপাধ্যায় সখেদে বলেছিলেন-'বাঙালীর কোন ইতিহাস নেই।' এই খেদ মনস্তাপ ও বেদনা কেবল বঙ্কিম চন্দ্রের একারই ছিল না, ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের, নেতাজী সুভাষ বসুর, ছিল কোটি বাঙালির। বাঙালির শত শত বর্ষের পুঞ্জীভূত কালিমা, গ্লানি ও অপবাদের অপনোদন করতে আবির্ভূত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি বাংলা ভাষীদের জন্য তিনি সৃষ্টি করলেন ইতিহাস। সে ইতিহাস বীরত্বব্যঞ্জক। উপহার দিলেন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি। সবুজের প্রেক্ষাপটে উদীয়মান রক্তিম সূর্য খচিত পতাকা। মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার। বিশ্ব সভায় পরিচিতি। বাঙালি, বাংলাদেশ একই সূত্রে গ্রথিত। অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য। শ্রেষ্ঠতম বিশ্ব নেতৃত্বের পঙ্‌ক্তিভুক্ত হলো তাঁর নাম। উচ্চারিত হলো জর্জ ওয়াশিংটন, লেলিন, মহাত্মা গান্ধী, মা ও সেতুং, হোচিমিন, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখের নামের সাথে। বঙ্গবন্ধু আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার।

প্রতি বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে কখনোই মেনে নিতে পারেনি। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক বঙ্গবন্ধুকে তারা নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয়েছিল দৈহিকভাবে। মুছে ফেলতে চেয়েছিল কোটি কোটি মানুষের হৃদয় থেকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব ও অমর। তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন ৫৫ হাজার বর্গমাইলের সবুজ-শ্যামল এই গাঙ্গের বদ্বীপে। বাংলাদেশের মতোই শ্বাশত, চিরায়ত ও দেদীপ্য বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্ব। বাংলাদেশকে মুছে ফেলতে পারলেও বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই সত্য বিস্মৃত হয়ে যারা ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টায় লিপ্ত, তারা বাস্তবিকই করুণার পাত্র।

বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ও স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রথম দেখেন ১৯৪৬ সালে। পাকিস্তান যে বাঙালিদের জন্য, বাংলাদেশের মানুষের জন্য নতুন উপনিবেশবাদী শাসন হবে-সেটা তিনি পাকিস্তান হওয়ার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। আর ১৯৪৬ সালে কলকাতায় অবস্থানকালে কয়েকজন সমমনা বন্ধু মিলে বঙ্গবন্ধু একদিন সিনেমা দেখতে ঢুকেন শ্যাম বাজারের একটি প্রেক্ষাগৃহে। উদ্দেশ্য সিনেমা দেখা নয়। সিনেমা হলের অন্ধকারে বসে বাঙালি জাতির চেতনার অস্তিত্ব রক্ষার পন্থা হিসেবে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরি, যা পরিণামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সহায়ক হবে। পাকিস্তান হওয়ার পর কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি গঠন করেন মুসলিম ছাত্রলীগ, আজ যা ছাত্রলীগ নামে পরিচিত। এই ছাত্রলীগ স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৯ সালের ২৪ জুন প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের

প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এসবই ঐতিহাসিক সত্য। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ও নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার পথে ঐতিহাসিক পদক্ষেপসমূহ:

মার্চ ১ থেকে মার্চ ২৬, ১৯৭০-এ প্রধান প্রধান ঘটনাপঞ্জি:

১৯৭১ : বঙ্গবন্ধুর পরামর্শক্রমে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়।

২ মার্চ, ১৯৭১ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

৩ মার্চ, ১৯৭১ : পল্টন ময়দানে ছাত্র সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন এবং স্বাধীনতার ইশতাহার পাঠ করা হয়।

৭ মার্চ, ১৯৭১ : রমনা ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, যা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা। লক্ষণীয় বঙ্গবন্ধুর উক্তি: 'রক্ত যখন দিয়েছি– রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'– আশু মুক্তিযুদ্ধের ইঙ্গিতবহ।

১৫ মার্চ, ১৯৭১ : বঙ্গবন্ধুর প্যারালাল সরকার গঠন। ৩৫ দফা রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত নির্দেশ। সেনা ছাউনিতে যাতে রসদ যেতে না পারে, যান চলাচল যাতে না হয় সে জন্য রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে চেক পয়েন্ট স্থাপন। জেনারেল ওসমানীকে বাঙালি সেনা অফিসারের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ছাত্র ও আনসারদের ট্রেনিং শুরু হয়।

১৯ মার্চ, ১৯৭১ : ছাত্রলীগের নিউক্লিয়াসের নেতৃবৃন্দদের ভারতে গিয়ে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৩ মার্চ, ১৯৭১ : সারাদেশে 'পাকিস্তান দিবস' উপলক্ষে পাকিস্তানি পতাকার বদলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এমনকি বিদেশি দূতাবাসগুলোও বাংলাদেশি পতাকা উত্তোলন করে।

২৫ মার্চ, ১৯৭১ : সন্ধ্যায় সম্ভাব্য পাক সামরিক অভিযানের আভাস পেয়ে দলীয় কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিববাদের-লেখক খোন্দকার মুহম্মদ ইলিয়াসকে বঙ্গবন্ধুর উক্তি 'আপনারা আশ্রয় পাবেন অস্ত্র পাবেন। সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি'। সে রাতে সর্বশেষ যিনি অবস্থান করেন সেই ওসমানীকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক একটি গোপন দলিল প্রদান করা হয়।

হাজী গোলাম মোর্শেদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে ছিলেন এবং তাকেও পাকবাহিনী বঙ্গবন্ধুর সাথে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। পরবর্তীতে তিনি বর্ণনা করেছেন, কীভাবে বঙ্গবন্ধু পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত বারোটা পার হয়ে গেলে অর্থাৎ ২৬ মার্চ '৭১-এর প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফের এক বন্ধুর মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা ইথার তরঙ্গে ছেড়ে দেন। এর পরপরই বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে টেলিফোন বেজে ওঠে। মোর্শেদ টেলিফোন ধরেন। অপর প্রান্ত থেকে বলা হয় 'বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী যথারীতি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখন বেতার সেট নিয়ে কী করবো-তা বঙ্গবন্ধুর কাছে জানা দরকার।' মোর্শেদ বঙ্গবন্ধুকে একথা জানালে তিনি টেলিফোনকারীদেরকে বেতার সেট নষ্ট করে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তার কিছু পরেই রাত একটার দিকে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। সে রাতেই ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী পৌঁছানো হয় চট্টগ্রামের তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে। তিনি উক্ত ঘোষণার সাইক্লোস্টার করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা

২৫ মার্চ ১৯৭১ : রাত ১.৩০ মি. ধানমন্ডি ৩২নং সড়কের বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতার হওয়ার আগে রাত ১২.৩০মি. দেশবাসীর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেলেন স্বাধীনতার ঘোষণা, যা টেলিপ্রিন্টারে সারা দেশে পৌঁছে দেওয়া হয়। ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে অস্থায়ী 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে সর্বপ্রথম প্রচার করা হয় এই ভাষণ

১০ জানুয়ারি ১৯৭২, সোহরাওয়াদী উদ্যান : স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

করেন।

তখন চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ হান্নানই কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় এম.এ হান্নান সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী কালুরঘাটস্থ 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে ৩ বার পাঠ করেন। ঘোষণাটি ইংরেজিতে থাকায় অধ্যাপক আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ঘোষণাটি বাংলায় অনুবাদ করেন।

১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ রাতে বর্বর পাকবাহিনী অতর্কিতে বাংলার জনগণের ওপর মরণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, ছাত্র ও যুবকরা তাদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে হানাদারদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে। সারা বাংলাদেশে হানাদারবাহিনীকে নির্মূল করার জন্য দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছে। সে সময় বঙ্গবন্ধুকে আটকের গোটা সময় একটি প্রশ্নই ইয়াহিয়া খানকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে পাক সরকারকে। যুদ্ধরত বাংলাদেশে তখন বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য মানুষ রোজা রেখেছে। নফল নামাজ আদায় করেছে। মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়েছে। শত্রু-মিত্র সবাই আজ এক বাক্যে স্বীকার করেন, সেদিন বঙ্গবন্ধুই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া, পালাবার মতো নেতা বঙ্গবন্ধু কোনোকালেই ছিলেন না। দেশ ও জনগণের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করার মতো মনোবল তিনি সবসময় পোষণ করতেন। অতিবড়ো শত্রুও তাঁর অসীম সাহসের প্রশংসা করেন। মৃত্যুর সময়েও তিনি তাঁর হত্যাকারীদের তর্জনি তুলে ধমক দিয়েছেন বলে হত্যাকারীরা স্বীকার করেছে।

প্রয়াত প্রখ্যাত অ্যান্থনী ম্যাসকারেন হাস-তার 'দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ' (The Rape of Bangladesh) এর এক জায়গায় লিখেছেন 'পাঞ্জাবী রাজনীতিবিদদের শঠতায় অতিষ্ট হয়ে আওয়ামী লীগ ফিরোজ খান নুনের পক্ষ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে ভিন্ন পথে চলার সিদ্ধান্ত নেন। শেখ মুজিব সেদিন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেন-'আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও থাকতে হবে। আমি অবশ্যই এসব দেখাব।' উক্ত উক্তি বঙ্গবন্ধু যখন করেন তখন ১৯৫৮ সাল। ফিরোজ মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে এবং চুন্দ্রীগড় সরকার তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বেতার ভাষণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, 'ঐ ব্যক্তি (মুজিব) ও তার দল পাকিস্তানে দুশমন। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে সার্বিকভাবে পৃথক করতে চায়। এবার তাকে শাস্তি পেতেই হবে। ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেবার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু সময়াভাবে অর্থাৎ তার আগেই পদত্যাগে বাধ্য হওয়ায় সেটা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

বঙ্গবন্ধু হলেন শতাব্দীর মহানায়ক। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। জাতির পিতা এবং বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। তিনি সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বঙ্গবন্ধুর কারণে আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র পেয়েছি। তাই বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা।

লেখক : প্রাবন্ধিক

বেগম রোকেয়া

আজও বাঙালি নারীর প্রেরণা

রোকেয়া আক্তার

বাঙালি তার জীবনে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বাঙালি নারীর জীবনে চড়াই-উতরাইয়ের এই বিষয়টি অনেক গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। বাঙালি নারীদের এই বিষয়টি গবেষণা করতে গিয়ে গবেষকরা বলছেন, যুগে যুগে বাঙালির ইতিহাসে এমন সব মনীষীদের আগমন ঘটেছে যারা সমাজ ও মানুষের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে তাদের কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে উজ্জীবিত করেছেন। বিশেষ করে সংস্কারকের ভূমিকায় দায়িত্বশীল নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। মহীয়সী রোকেয়া এমনই ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর সময়ের চেয়ে একশ অথবা দুইশ বছর এগিয়েছিলেন। তাঁর ছিল আধুনিক, উদার ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। আর এসব কারণে তারা বলছেন, বাংলার অসহায় নারী জাগরণে মহীয়সী রোকেয়ার ক্ষুরধার লেখনীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। একশ বছর পূর্বে তিনি তাঁর লেখায় নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা প্রসঙ্গে যেসব কথা বলেছেন তা বর্তমানে গভীরভাবে উপলব্ধি করা হচ্ছে তা শুধু নয়, নারী তার মেধা, দক্ষতা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে।

বিশিষ্ট গবেষক সুফী মোতাহার হোসেন বেগম রোকেয়ার জীবন বিশ্লেষণে বলেছেন, 'আমাদের সমাজে 'স্বামী' শব্দটি প্রকৃত তাৎপর্য হারিয়ে প্রভু অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিবাহিত পুরুষের এরূপ মনোভঙ্গি যেন তার বিবাহিতা স্ত্রীর প্রভু সে। রমণীর ওপর পুরুষের সকল প্রকার প্রভুত্বের বিরোধী ছিলেন বেগম রোকেয়া। তাঁর মতে, স্ত্রীও মানুষ, মানুষ হিসেবে তার অধিকার সমান। স্বামী স্ত্রীর প্রভু নয় কিংবা স্ত্রীও স্বামীর দাসী নয়। স্বামীর ওপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর সমান অধিকার, এটা ইসলামেরও বিধান।' (*বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৯৩)

নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে হবে বলে আজকের নারীবাদীরা যখন গলাবাজি করে তখন আমাদের ভাবতে অবাক লাগে সেই কবে বেগম রোকেয়ার মতো সাহসী নারী উচ্চারণ করেছিলেন নারী স্বাধীনতার কথা। নারীর অধিকারের কথা। নারী প্রগতির কথা। বেগম রোকেয়া তাঁর সাহস আর দূরদর্শিতা দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন আগামী দিনের বাংলাদেশের নারীদের কথা। নারীদের অগ্রযাত্রার কথা। নারীর ক্ষমতায়নের কথা। গবেষকরা তাদের গবেষণায় ইঙ্গিত দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন, সম্ভবত আগামী দিনের বাংলাদেশে নারীরা যে তাদের মেধা ও যোগ্যতার নিরিখে দেশ পরিচালনায় আসবে তার পূর্বাভাসও কি পেয়েছিলেন বেগম রোকেয়া? তারা বলছেন, এটা না হলে অত আগে কীভাবে বেগম রোকেয়া উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন এই কথা, 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টার, লেডি জজ সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডি viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে রাণী করিয়া ফেলিব।' শুধু তাই নয়, বেগম রোকেয়া নারীর উপার্জনের পথের সব বাধাবিপত্তি দূর করে নারীকে তার অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে মনোবল জুগিয়ে বলেছেন, 'উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?'

রোকেয়ার জন্ম রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। ধর্মান্ধ জমিদার পিতার বিলাসিতা ও অদূরদর্শিতার কারণে তাঁদের পারিবারিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। রোকেয়া তাঁর বড়ো বোন ও দু'ভাইয়ের কারণে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর ভেতর পড়াশোনার উৎসাহ তৈরি হয়। তাঁর পিতা ছিলেন কঠোরভাবে ধর্মান্ধ। পিতার এই বিষয়টিকে রোকেয়া সহজে মেনে নিতে পারেননি। প্রতিবাদী মানসিকতা তৈরি হয় রোকেয়ার ভেতর। এই অবরোধ ও অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ার পরও রোকেয়ার ভেতর গড়ে ওঠে অন্য এক আধুনিক চিন্তাচেতনা।

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বেগম রোকেয়ার মতাদর্শের অনুসারী কবি শামসুন্নাহার মাহমুদ রোকেয়ার জীবনাচরণ চিত্রণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রোকেয়া যেখানে গিয়াছেন সর্বত্রই তাহার চোখের সম্মুখে তীব্রভাবে জাগিয়াছে নারীর পরাধীনতার বীভৎস রূপ। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা যেন ভীষণ ব্যাধির মত আগাগোড়া ছাইয়া ফেলিয়াছে বড় নিষ্করুণ, বড় মমতাহীন সে কাল ব্যাধির আক্রমণ।' (*রোকেয়া জীবনী*, পৃ. ২৭)

বেগম রোকেয়া যে সময়ে নারী স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলেন তা আজকের দিনের জন্য সত্যি সত্যি অচিন্তনীয়। কঠোর পারিবারিক বিধিনিষেধের ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠলেও তাঁর ভেতরে ছিল প্রজ্জ্বলিত মশাল। শৈশবে ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করলেও পরে বাংলা ও ইংরেজি অক্ষর শিখে তাঁর জ্ঞানের প্রসার ঘটান। রোকেয়া আরবি, উর্দু ও সংস্কৃতি ভাষায়ও জ্ঞান লাভ করেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় বিহারের অধিবাসী চল্লিশোর্ধ বিপত্নীক ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। বিয়ের পর তিনি রোকেয়ার শিক্ষা ও সাহিত্য সাধনায় সহযোগিতা করেন। রোকেয়ার লেখনীর উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার। বাঙালি মুসলমান

সমাজের পিছিয়ে পড়ার কারণগুলো তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

আজ থেকে প্রায় একশ ছয় বছর আগে ১৯১০ সালে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে রোকেয়া নারী শিক্ষার ক্ষেত্রকে দশদিগন্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়া নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন আজ আমরা তার প্রকাশ দেখতে পাই।

বেগম রোকেয়া সেই অবরোধ্য সময়ে লেখনীর মধ্য দিয়ে পুরুষের কাছে এই তথ্যটি দিতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, নারীদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। শুধু তাই নয়, সমাজে নারীরা আর পিছিয়েও থাকবে না। বিশেষ করে তাঁর *সুলতানার স্বপ্ন* পড়লে এ বিশ্বাস জন্মে। লেখাটি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় রোকেয়া তাঁর স্বামীকে পড়তে দেন। স্বামী সাখাওয়াত হোসেন *সুলতানার স্বপ্ন* পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে যান এবং বলেন, ‘এটা একটা ভয়ংকর প্রতিশোধ।’ একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই প্রতিশোধ ছিল আসলে সমাজের উগ্রপন্থিদের বিরুদ্ধে যারা নারীর অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল। বেগম রোকেয়ার গবেষকরা তাঁর *সুলতানার স্বপ্নকে* আদতে রোকেয়ার স্বপ্ন বা কল্পনাশক্তির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। রোকেয়া নারীকে নানাভাবে, বিচিত্ররূপে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল নারীর ক্ষমতায়ন এবং অগ্রযাত্রা। আমাদের পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটছে। বিশ্বব্যাপী সব দেশেই নারীর ক্ষমতায়ন আজ উন্নয়ন ও প্রগতির অন্যতম ধারা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রোকেয়ার *পদ্মরাগ* উপন্যাস এবং অন্যান্য রচনাতেও তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। বেগম রোকেয়ার সুদূরপ্রসারী নারী জাগরণের স্বপ্ন ফুটে ওঠে *সুলতানার স্বপ্নে*। তাঁর জীবনীকার লেখিকা শামসুন্নাহার মাহমুদ বলেছেন, ‘বাস্তবিকই *সুলতানার স্বপ্নে* তিনি এক অতি উচ্চ আদর্শের অবতারণা করিয়েছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন এক অপূর্ব, অদ্ভুত নারী রাজত্ব। পুরুষ সেখানে পর্দার আড়ালে গৃহকোণে আবদ্ধ। আর নারীরা এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আশ্চর্য্য শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কাজ চালাইতেছেন। দুনিয়ার যত পাপতাপ, যুদ্ধবিগ্রহ সবকিছুর জন্য তিনি দায়ী করিয়াছেন পুরুষকে। অবরোধ রুদ্ধ, সেখানে দুঃখকষ্ট, অশান্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই। সেখানে চারিদিকে খালি শান্তি আর শান্তি। তাঁহার এই স্বপ্ন সফল হইতে হয়ত বহুদিন লাগিবে। হয়ত বা এই স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার এই একটি মাত্র স্বপ্ন হইতেই মানুষ বহুকাল পরেও এক নিমেষেই বুঝিতে পারিবে, তাঁহার নারীত্বের আদর্শ কত উচ্চ ছিল নারীর শক্তিতে, তাহার বিশ্বাস কত পর্বত প্রমাণ ছিল।’ (*রোকেয়া জীবনী*, পৃষ্ঠা. ৮০)

অতীত ইতিহাস আমাদের সাক্ষ্য দেয়, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি মুসলিম সমাজও একটা সময়ে নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধিতাকারী ছিল। সেসময়ে বিশ্বাস করা হতো, নারী ঘরের বাইরে এলে এবং পরপুরুষের দৃষ্টিতে পড়লে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার আইন পাস হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত আন্দোলনে ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীদের ভাগ্যোন্নয়নে এটা একটা মাইলফলক। নিষ্ঠুর বহুবিবাহ বন্ধ হয়। তারা নারীশিক্ষার জন্য আন্দোলন করেন। উনবিংশ শতাব্দীতেই আমরা দেখতে পাই ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এবং শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

নারী গবেষকরা তাদের লেখায় বলছেন, অবরোধ প্রথা ও বোরখায় বন্দি মেয়েরা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভুবনের বাসিন্দা ছিল। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা কখনো ঘরের বাইরে যাবার অধিকার পেত না। একমাত্র ধর্ম ও গার্হস্থ্য শিক্ষা গ্রহণে এবং সন্তান পালনে বাধ্য করা হতো। ধর্মের নামে মিথ্যা ফতোয়া, কুসংস্কার এবং নারীবিরোধী প্রচার ছাড়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেন আর কিছু জানতো না। ব্রিটিশরা ভারত শাসন শুরু করলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শিক্ষা, চাকরি ও ব্যবসায় দ্রুত ভাগ্যোন্নয়ন করে তোলে, কিন্তু মুসলিম সমাজের ঘুম ভাঙে অনেক দেরিতে। সেসময় কুসংস্কার ছিল এমন যে, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকেও মনে করা হতো পাপ।

রোকেয়ার কী স্বপ্ন ছিল? তাঁর স্বপ্ন ছিল নারীর ক্ষমতায়ন এবং একমাত্র ক্ষমতায়ন। আর এই ক্ষমতায়ন ঘটাতে

রোকেয়া চারটি জিনিস চেয়েছিলেন সেগুলো হলো– এক. পুরুষের সম-অধিকার। দুই. নারীর শিক্ষার্জন। তিন. নারীর অর্থোপার্জন এবং চার. সর্বক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা। প্রয়াত সাংবাদিক ও নারী নেত্রী বেবি মওদুদ ২০০৮ সালে বেগম রোকেয়ার ওপর লিখিত এক স্মারক বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, 'পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর বিরুদ্ধাচরণ, নারীর অবদমন-নির্যাতন-বঞ্চনা-বৈষম্য ও শোষণের চিত্রটি শুধু ব্যথিত করেনি, বিদ্রোহী করে তোলে। ধর্মান্ধ নারী বিদ্বেষী পুরুষের বিরুদ্ধে কলম ধরে তিনি যে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন তার সাফল্য আজ একশ বছর পর সফল হয়েছে। নারী এখন আর গৃহবন্দি, নিরক্ষর, কর্মহীন নয়। নারী শুধুমাত্র গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান ও লালনপালনকারী নয়। নারী শুধু বিনোদন বা যৌনসঙ্গী নয়। নারী শুধুমাত্র কলুর বলদ ও গার্হস্থ্য ক্রীতদাসী নয়। নারী এখন শিক্ষার্জন করে মেধা-মননে এবং দক্ষতা ও যোগ্যতায় পুরুষকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তার সমকক্ষ হচ্ছে। নারী এখন শ্রমশক্তি দিয়ে কৃষি-কলকারখানায় কাজ করছে। নারী এখন পরিবারে-সমাজে সমাদৃত হচ্ছে, তাঁর অবদানে দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। নারী এখন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে, পুরুষের স্থান দখল করতে সমর্থ হচ্ছে।' একই বক্তব্যে বেবি মওদুদ আরো উল্লেখ করেছেন, 'রোকেয়ার মনন চর্চায় নারী ছিল একমাত্র অবলম্বন। তাঁর একমাত্র ধ্যান ছিল নারীর বিকাশ, প্রতিভার প্রকাশ। শ্রমশক্তির অবদান তিনি দেখতে চেয়েছেন সর্বত্র। আর সেজন্য নারীকে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি নারীকে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অধিষ্ঠিত হতে দেখতে চেয়েছেন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে নারীর পদচারণ চেয়েছেন।'

আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখতে নারী। অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় জোরালো বক্তব্য রাখছে এবং প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে তারা। নারীর সততা, আন্তরিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নারী শুধু মমত্বের স্পর্শ রাখছে না, নারী-পুরুষের সমতা গঠনে এবং বৈষম্য দূরীকরণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নারীর স্বার্থে আইন প্রণীত হয়েছে, নারীর ভাগ্যোন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে– যাতে অসহায় হয়ে জীবন কাটাতে না হয়।

জাতিসংঘ নারীর প্রতি বৈষম্য অবমোচনে সনদ ঘোষণা করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তা বাস্তবায়নে বাধ্য করছে। নারী উন্নয়নে নীতি প্রণীত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রকল্প সাহায্য দেবার অন্যতম শর্ত হচ্ছে নারীর অংশগ্রহণ এবং উন্নয়ন থাকতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটছে। উন্নত দেশগুলোতে নারী-পুরুষের সমকক্ষ হয়ে সর্বত্র কাজের সুযোগ পাচ্ছে। নারী এখন নির্বাচনি লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রে ক্ষমতাসীন হচ্ছে। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান হচ্ছে। আমরা প্রশাসনের তৃণমূল পর্যায়েও নারীর ক্ষমতায়ন দেখছি।

রোকেয়ার নারী এখন জজ, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ নারী ক্ষমতায়নের মডেল হিসেবে পরিচিত হতে সমর্থ হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোতেও আমরা এর প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। আরব দেশগুলোতে নারী ভোটাধিকার ও নির্বাচনের সুযোগ পাচ্ছে। সেখানে নারীর স্বার্থে আইনের কড়াকড়ি শিথিল হচ্ছে। মেয়েরা শিক্ষার্জন করছে, কাজ করার বা ব্যবসা করার সুযোগ পাচ্ছে। আমরা একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি, নারী যেখানে অন্ধকারে শৃঙ্খলের বেড়াজালে বন্দি জীবনযাপনে বাধ্য থাকত, সেখান থেকে তাদের আলোক ঝর্ণাধারায় নিয়ে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। পিছিয়ে থাকা নারী এখন মাথা উঁচু করে মুখ তুলে সামনে এগিয়ে চলছে।

সাংবাদিক বেবি মওদুদ তার একাধিক লেখায় বেগম রোকেয়ার জীবনের ওপর আলোকপাত করে দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশে নারীর অগ্রযাত্রা ও তাঁর স্বপ্ন পূরণে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। রোকেয়ার মৃত্যু হয় ১৯৩২ সালে। সেসময় মুসলিম মেয়েরা স্কুল শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে এলেও তা যে খুব একটা উল্লেখযোগ্য তা বলা যাবে না। বেবি মওদুদ উল্লেখ করেছেন, '১৯২৫ সালে ভোটাধিকার, ভারত ভাগের পর সংসদে মহিলা কোটায় মনোনয়ন, রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং সরকারি বেসরকারি সব ধরনের পেশায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। ১৯৬১ সালে নারী আন্দোলনের ফলে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং প্রথম স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিবাহ করলে শাস্তিযোগ্য আইন হয়। ২০০০ সালে সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মায়ের নাম স্বীকৃতি পায়। এতসব অর্জন নারীকে সাহসী ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারী স্বাধীন মতো চলাচল, জীবনযাপন, পেশা গ্রহণ, বিদেশ ভ্রমণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ করার অধিকার পেয়েছে।

রোকেয়া একশ বছর পূর্বে বাংলাদেশের সকল নারীকে রানি করার যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তার অনেকখানি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি সত্য। ... শহর কেন্দ্রিক সুবিধাভোগী নারী তার ভাগ্য জয় করতে সক্ষম হলেও দেশের যে বৃহত্তর নারী হতদরিদ্র-দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারে বসবাস করে মা-কন্যা-বধূ হিসেবে, সেখানে রয়েছে পশ্চাৎপদতা। ধর্মীয় অপব্যাখ্যায় তাদের বাধ্য থাকতে হয়। উচ্চশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, নিরক্ষর, ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণির পুরুষের মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকাশ দেখা যায়। ফলে নির্যাতনের অভিশাপে আজও তারা অসহায়-অবহেলিত। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলেও ধর্মীয় অন্ধতা, সামাজিক অপবাদ এবং পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়ে থাকে। পরিবারে পিতার পর ভাইরা হয়ে ওঠে অভিভাবক। শিক্ষা গ্রহণ ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। একইভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুর বা ভাশুর ও দেবর হয়ে ওঠে অভিভাবক এবং সেখানে বঞ্চনার কোনো কমতি থাকে না। কন্যাসন্তানের শিক্ষা ও লালনপালনে অবহেলার সীমা নেই। বাল্যবিবাহ, যৌতুক, বহুবিবাহ আজও ছোবল দিয়ে যায়। এরপর তাদের বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীর পরিচয় হয়ে ওঠে। এছাড়া অপহরণ, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতেও বাধ্যকরণ, বিদেশে পাচার করার মতো ঘৃণ্যতম কর্মকাণ্ডগুলো পুরুষই করে থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীকে তারা অর্থ দিয়ে সহায়ক বানায়।'

রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল নারীর ক্ষমতায়ন। সেই ক্ষমতায়ন নারী সম্ভব করেছে সত্য, কিন্তু তিনি কখনো পুরুষকে অবদমিত রাখেননি। শাসক হিসেবে দেশ পরিচালনায় নারী-পুরুষের ভেদাভেদ করেননি, বৈষম্য বঞ্চনায় শোষণ করেননি বরং নারীকে তার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা দিয়ে পুরুষের সমকক্ষ করে তুলতে সাহায্য করেছেন। কোনোপ্রকার স্বেচ্ছাচারী মনোভাব দেখাননি। সমাজে নারী-পুরুষ একই সঙ্গে কাজ করবে এবং দেশ ও জাতি গঠনে অবদান রাখবে– সেই পদক্ষেপ নিয়েছেন। রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল এটাই। এই স্বপ্নভঙ্গ আমরা দেখতে চাই না। নারীর ক্ষমতায়ন আরো ঘটুক, সমাজ, দেশ ও মানুষের কল্যাণে স্বস্তি ও শান্তি বয়ে আনুক।

লেখক : কথা সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

স্মৃতি ঘেরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

এফ রহমান রূপক

রমনার ইতিহাস শুরু হয় ১৬১০ সালে যখন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবেদার ইসলাম খান ঢাকা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এই এলাকায় তখন উন্নত বসতবাড়ি ছাড়াও মসজিদ, বাগান, সমাধিসৌধ, মন্দির গড়ে ওঠে। এ সময় ঢাকার কেন্দ্রস্থলে সুপরিসর এই নগর উদ্যান গড়ে উঠেছিল রমনা নামে। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে রমনা তার সৌন্দর্য হারায়। ইংরেজদের আমলে ১৮২৫ সালে ঢাকার ইংরেজ কালেক্টর মি. ড'স ঢাকা নগরীর উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ নেন। তিনি জেলের কয়েদিদের নিয়ে রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করে বের করে এনেছিলেন ডিম্বাকৃতির একটি অংশ। এর ফলে শহরের উত্তরাঞ্চল পরিচ্ছন্ন হয়ে উন্মুক্ত হয়েছিল বায়ু চলাচলের পথ। পরিষ্কার করা অংশটিকে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘিরে তৈরি করা হয়েছিল রেসকোর্স। এখানে প্রতি রবিবার ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এ সময় রেসকোর্সের উত্তর-পশ্চিমে একটি টিলা তৈরি করে তার চারদিকে ফার গাছ লাগানো হয়েছিল। আর টিলার উপর তৈরি করা হয়েছিল গথিক রীতির ছোটো একটি ঘর। তখনকার ঢাকার শিক্ষিত লোকজন বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন ড'সের ফুল। প্রাতঃভ্রমণ শেষে ইউরোপীয়রা মিলিত হতেন ড'সের টিলায় কফি খেতে। মূল শহরের সঙ্গে রেসকোর্সকে যুক্ত করার জন্য ড'স উত্তর-পূর্ব দিকে তৈরি করেছিলেন একটি রাস্তা, যেটা এখন কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ নামে পরিচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আলেম মুফতি দীন মহম্মদ কর্তৃক সংগঠিত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্তে ১৯৪৯ সালে রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী রেসকোর্স ময়দান। এখানেই ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেছিল, 'উর্দু-ই হবে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয় এই ময়দানে। ১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারি এখানে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। এখানেই ১৯৭১-এর ৭ মার্চে ভাষণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর এই রেসকোর্স ময়দানেই পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছিল। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালত গঠন করে গোলাম আযমের বিচারের। ১৯৭১ সালে বিজয়ের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামানুসারে রমনা রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি সুপরিসর নগর উদ্যান। এটি পূর্বে রমনা রেসকোর্স ময়দান নামে পরিচিত ছিল। এক সময় ঢাকায় অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদের সামরিক ক্লাব এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীতে এটি রমনা রেসকোর্স এবং তারপর হয় রমনা জিমখানা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর মাঠটিকে কখনও কখনও ঢাকা রেসকোর্স নামে ডাকা হতো এবং প্রতি রবিবার বৈধ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এটি একটি জাতীয় স্মৃতিচিহ্নও বটে কেননা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণ এখানেই প্রদান করেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই উদ্যানেই আত্মসমর্পণ করে মিত্রবাহিনীর কাছে। রেসকোর্স ময়দানের অদূরে অবস্থিত তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের স্থান হিসেবে প্রথমে নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তীতে আত্মসমর্পণের জন্য এই মাঠটি নির্বাচন করা হয়। নাজির হোসেন *কিংবদন্তির ঢাকা* গ্রন্থে লিখেছেন, ব্রিটিশ আমলে রমনা ময়দানটি ঘোড়দৌড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রতি শনিবার হতো ঘোড়দৌড়। এটা ছিল একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসক ও সর্বস্তরের মানুষের চিত্তবিনোদনের একটি স্থান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদের এক বিবরণ থেকে জানা যায়, চার্লস ডজ রমনায় রেসকোর্স বা ঘোড়দৌড়ের মাঠ নির্মাণ করেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার খ্যাতনামা আলেম মুফতি দীন মহম্মদ এক মাহফিল থেকে ঘোড়দৌড়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এ কারণে সরকার ১৯৪৯ সালে ঘোড়দৌড় বন্ধ করে দেয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামানুসারে রমনা রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান রাখা হয়।

লেখক : সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক গণমুক্তি

ছয় দফা ও আমাদের স্বাধীনতা

সাদিয়া সুলতানা

ছয় দফা ও আমাদের স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছয় দফা ছিল পূর্ব বাংলার মুক্তি সনদ। ছয় দফা ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামাও। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে যোগদান করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য ৬ দফা তুলে ধরেন।

ভাষা আন্দোলনকে আমাদের স্বাধীনতার সূতিকাগার বলা যেতে পারে। '৬৬ সালে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কিন্তু ৬ দফার মর্ম বুঝতে পেরেছিল। আইয়ুব খানও অস্ত্রের ভাষায় ৬ দফার জবাব দিয়েছিলেন। জেলজুলুম সইতে হয়েছে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের।

৬ দফায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিকসহ সব ধরনের অধিকারের কথা তুলে ধরা হয়। আইয়ুব সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করে ৬ দফাকে। এই কর্মসূচি বাঙালির জাতীয় চেতনাকে নাড়া দিয়ে যায়। যদিও প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা ৬ দফায় বলা হয়নি কিন্তু এই কর্মসূচি বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির প্রতীক। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে পাকিস্তান সরকার ৬ দফা গ্রহণ করতে না পেরে শুরু করে বাঙালির ওপর দমন-পীড়ন। বাঙালিদের গণ-আন্দোলন তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলার মুক্তিকামী মানুষ সেদিন বুঝেছিল সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। একথা সকলেরই জানা যে, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ১ নাম্বার আসামি করা হয়। সেসময় রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তাসহ মোট ৩৫ জনকে আসামি করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২১-এ ও ১৩১ ধারায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র পন্থায় স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করার অভিযোগ আনা হয়।

মামলা শুরু হয়। গর্জে ওঠে সারা বাংলা। ছাত্রসমাজের ১১ দফার ভিত্তিতে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যেন গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনের ভিত্তিতে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয় তারই ধারাবাহিকতায় 'ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা' বাঙালিকে এগিয়ে দেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। তাই বলা চলে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনে আগরতলা মামলা, ৬ দফা ও ১১ দফা বিশেষ ভূমিকা রাখে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে ৬ দফা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণের ন্যায্য অধিকার ও দাবি কখনোই মেনে নেয়নি।

বাঙালির মুক্তির অগ্রদূত, বাংলার জনগণের পরম বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে– পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরের প্রায় অর্ধেক সময়ই তাঁর কারাগারে কেটেছে।

স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর আমাদের অর্জন অনেক। হারিয়েছি যেমন, পেয়েছিও অনেক। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফায় ন্যায় ও সমতার কথা বলা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও শাসকরাই বিরোধিতা শুধু ৬ দফার করেনি, এদেশের অনেকেই বিরোধিতা করেছে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের কট্টরপন্থি বাম ও ডান নেতারা। কিন্তু ৬ দফায় ছিল এদেশের মানুষের অধিকার ও মুক্তির কথা। আপামর জনগণ যা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল। দফাগুলো হচ্ছে–

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দু'টি বিষয় থাকবে। প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অন্য সব বিষয়ে অঙ্গ রাজ্যেগুলোয় পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৩. সারাদেশে হয় অবাধে বিনিময়যোগ্য দু'ধরনের মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন করা।

৪. সকল প্রকার কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকার আদায়কৃত রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৫. অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে-এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধাসামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া।

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সবদিক থেকে উল্লেখ করার মতো। পেশাজীবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষ যার যার অবস্থান থেকে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্ত করে জাতীয়বাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০-এর সাধারণ নির্বাচন এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যেন একই সূত্রে গাঁথা। বাঙালির যত অর্জন তা জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শেই অর্জিত হয়েছিল। '৬৯-এর ২৫ মার্চ যখন আইয়ুব খান পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন, ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন। ২৮ মার্চ এক ঘোষণায় পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয় তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক। ইতপূর্বে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে সংশয় ছিল, ছিল আশঙ্কা, নির্বাচন হবেতো। অবশেষে! ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম 'এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অংশ নেয় আওয়ামী লীগ (ন্যাপ) ওয়ালী, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি, ডেমোক্রেটিক পার্টি জামাত-ই-ইসলামি প্রভৃতি দল। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনকে ৬ দফার পক্ষে গণভোট হিসেবে অভিহিত করে। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। এছাড়া ১৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন আওয়ামী লীগ পায়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এই বিজয় ছিল নজিরবিহীন। আওয়ামী লীগ এককভাবে সরকার গঠন ও ৬ দফার পক্ষে গণরায় লাভ করে। ফলে ৬ দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের শাসকদের জন্য নির্বাচন বিরাট পরাজয়ের ছিল। বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র হতে থাকে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পেছনে এই নির্ধারক অপরিহার্য হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অগ্রযাত্রায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ৬ দফা ছিল বিরাট দর্পণস্বরূপ। যার পরিণতিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

লেখক : কবি ও সাংবাদিক

আলো দেখা

সেলিনা হোসেন

আমি একাত্তরের বীরাঙ্গনা। আপনারা আমাকে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি এসেছি। আমি জানি আমি যদি আপনাদের আমন্ত্রণে রাজি না হয়ে এখানে আসতে অস্বীকার করি তবে স্বাধীনতাকে আমার জীবন থেকে আড়াল করা হয়। স্বাধীনতার জন্য আমার বীরাঙ্গনা হওয়া –এই সত্য আমি আমার এক জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি। আমি যখন স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করি তখন পাশাপাশি বীরাঙ্গনা হওয়ার চিত্রটিকে পাশে রাখি। সবাইকে বলি, দেখ আমার শরীরের সবটুকু দিয়েছি স্বাধীনতার জন্য। শরীর যদি জমিন হয়, তবে সেই জমিনে একবিন্দু জায়গাও বাদ যায়নি স্বাধীনতার জন্য বলিদান থেকে। সেদিন ছিল শবেবরাতের রাত শুক্রবার।

এই প্রজন্মের তোমরা, আমার মুখের দিকে শুকনো মুখে তাকিয়ে থেকো না। আমাকে দয়া দেখিও না, করুণা করো না। একজন নারী খুব সহজে বীরাঙ্গনা হতে পারে না। বীরাঙ্গনা হওয়ার জন্য স্বাধীনতার মতো বড়ো ঘটনা লাগে। আমি সেই ঘটনার গৌরবভাগী। আমি যে অন্যায়ের শিকার হয়েছি তার দায় আমার একার নয়, এটি বীরাঙ্গনার দায়। আমার সেই সাহস আছে, আমার জন্য দেশ কী করল সে খোঁজ আমি রাখতে চাই না। সেদিকে আমি বুড়ো আঙুল দেখাই। বলছিলাম একটি দিনের কথা, সেদিন ছিল শুক্রবার আর শবেবরাতের রাত। আম্মা আমাদের পাঁচ ভাইবোনকে রোজা রাখতে বলেছিলেন। আব্বা-আম্মার সঙ্গে আমরাও রোজা রেখেছিলাম। শবেবরাতের নামাজ পড়ার জন্য ওজু করেছি মাত্র।

সারারাত জেগে নামাজ আর কোরানশরিফ পড়ার জন্য আমি তৈরি হয়েছিলাম। ঠিক সেই সময় শামসু রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে দুইজন পাকসেনা আমাদের বাড়িতে ঢোকে। আমি ওদেরকে দেখে দৌড়ে গিয়ে কোরানশরিফ বুকে চেপে ধরি। এটুকু বলে থামে চানবরু।

আজকেও শুক্রবার। তবে শবেবরাতের রাত নয়। আজকে পঁচিশের রাত, গণহত্যার রাত। চানবরু দম ফেলে চারদিকে তাকায়। ওর সামনে শত শত ছেলেমেয়ে। প্রত্যেকের মুখ আলোর মতো জ্বলছে। একটি মেয়ে ওর সামনে এসে বসে বলে, এই ফুলটি আপনার জন্য। এটাতো গোলাপ, আমি শিউলি ফুল ভালোবাসি। এখন তো শিউলি ফুলের সময় না। শরতে শিউলি ফুল ফুটলে আপনার ঘর আমরা শিউলি ফুল দিয়ে ভরে দেব। চানবরুর চমৎকার হাসি ওদের মন ভরিয়ে দেয়। ওরা কয়েকজন একসঙ্গে বলে ওঠে, তারপর কী হয়েছিল? তারপর? তারপর, চানবরুর ঠোঁট কাঁপে একটুক্ষণ চুপ থেকে দু'চোখ বড়ো করে বলে, তারপরে চানবরু ইতিহাস হয়। সেই ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে যোগ হয়। এখন তো আপনেরা চিল্লায়ে বলেন – চানবরু কথা শেষ না করে থেমে গেলে ছেলেমেয়েরা স্লোগান দেয়, আমাদের ধমনীতে বীরাঙ্গনার রক্ত।

মুহুর্মুহু স্লোগান ধ্বণিত হতে থাকলে চানবরু বেকুবের মতো তাকায়। দৃষ্টি এক জায়গায় ধরে রাখতে পারে না। দৃষ্টি ঘুরতে থাকে প্রজন্ম চত্বরের সবটুকু জুড়ে। চানবরু বলতে থাকে, ওই ঘটনার তিন-চার দিন আগে আমাদের বাড়ির সামনে আমাকে একলা পেয়ে শামসু রাজাকার বলেছিল, পাকিস্তানি সেনাগুলো দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে লড়াই করছে। ওদের সেবা করলে অনেক সোয়াব পাবি। তার ভাগ্যে বেহেশত নাজিল হবে। আমি দৌড় দিয়ে চলে আসতে চাইলে শামসু রাজাকার খপ করে আমার হাত ধরে বলেছিল, মেয়েটা খালি ডরায়। আমি এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকেছিলাম। আমি ততদিনে শুনেছিলাম সেবা মানে কী, কীভাবে সেবা করতে হয়, আমি চৌকির নিচে ঢুকে আমার গায়ের কাপুনি থামিয়েছিলাম। থামে চানবরু, ঘোমটা ঠিক করে। কেউ একজন বলে, পানি খাবেন? পানি না, বুকের ভেতরের জ্বালা শুধু পানি খেয়ে ঠান্ডা হয় না। এতদিনে পানির তেষ্টা শেষ হয়ে গেছে। সেদিন আমি কোরানশরিফ বুকে চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের একজন আমার হাত ধরে হেঁচকা টান দেয়। আমার হাত থেকে কোরান শরিফ ছিটকে পড়ে। আমি কোরানশরিফ মাটি থেকে ওঠাতে গেলে একজন আমাকে পেছন থেকে লাথি দেয়। আমি যেন পড়ে না যাই সেজন্য একজন আমাকে ধরে রাখে। দেখতে পাই শামসু রাজাকারের পায়ে লেগে কোরান শরিফ বারান্দা থেকে নিচে পড়ে যায়। ওরা আমাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসে। বাইরের মাঠঘাটে তখন জ্যোৎস্না। শুনতে পাই ভাইবোনেরা চিৎকার করে কাঁদছে। আমার মাথার ভেতরে ঘূর্ণি, আমার বয়স আঠারো। ওরা আমাকে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। আমার দিনরাত একাকার হয়ে যায়। শুধু মনে হয় কোরানশরিফ বুকে চেপে ধরতে পারলে আমার বুকের জ্বলুনি থামতো। কিন্তু কোথায় পাবো কোরানশরিফ? আমি এখনও মনে করি যে কোরানশরিফে শামসু রাজাকারের পা লেগেছে তার জন্য ওর ওপর আল্লাহর গজব পড়বে। ও আমাকে বাড়ি থেকে টেনে বের করেছে কিন্তু তার আগে কোরানশরিফ তুলে রাখেনি। স্লোগান ওঠে চারদিকে– ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই। রাজাকারের ফাঁসি চাই। গগনবিদারী স্লোগান প্রকম্পিত করে চারদিক। চানবরু, তাঁর চোখের সামনে এক অবিশ্বাস্য সময়। দেখে মনে হয় নত হয়ে আসছে আকাশ। তার স্মৃতিতে ভাসতে থাকে নির্যাতনের চিত্র। ওহ, কতভাবে নির্যাতিত হয়েছি শুধু স্বাধীনতার জন্য। শুধু স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পরের দিনগুলোও ছিল ভয়াবহ। কত গ্লানি! কত অপমান! প্রথমে বাড়ি থেকে বের করে দেয় বাবা। মাও মুখ ফিরিয়ে রাখে। দুই চোখে আঁধার নিয়ে রাস্তায় নামি। ভিক্ষা করি। ঘরে কেউ জায়গা দেয় না। হাটবাজারে ঘুরে ফলমূল কুড়িয়ে খাই। একদিন বটগাছের নিচে বসে থাকার সময় ছোটো একটা বাচ্চা ছেলে বলে, দেখ্ দেখ্ ওই মহিলা পাকিস্তানি মিলিটারির সঙ্গে থেকেছিল। একজনের এই কথা শুনে অন্যরা হি-হি করে হাসে। হাসতে হাসতে ওরা আমার সামনে এসে উবু হয়ে বসে। একজনে একটা আধা-খাওয়া পেয়ারা দিয়ে বলে, খা। আমি জিজ্ঞেস করি, এই কথা কে বলেছে তোদেরকে? গাঁয়ের সবাই জানে। সবাই বলে। তোরা কী বুঝিস? সব বুঝি, সব বুঝি। হি-হি করে হাসতে হাসতে ওরা ওঠে দৌড় দেয়। ওদের হাসি এখনও আমার দু'কান ভরে বাজে। চানবরু চুপ করে। চারদিকে স্লোগান ওঠে। ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই – আজ কি আমার পুণ্যের দিন! ও আল্লারে, আমার বুকের মধ্যে এই কথা তো রাতদিন গুমরে মরেছে। আমিওতো রাজাকারের ফাঁসি চেয়েছি। কিন্তু আমিতো এত বছর ধরে পুড়ে মরেছি, শুধু মুখ ফুটে বলতে পারিনি। ও আল্লারে – চানবরু দু'হাত আকাশের দিকে তোলে। কেউ একজন সামনে এসে বলে, আপনার বুকের কথা আমরা শুনতে পেয়েছি। আপনাকে যারা নির্যাতন করেছে, তারা অপরাধী। তাদের বিচার হতেই হবে। চানবরু বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে কেঁদে বুক ভাসায়। ও আল্লারে – ও আল্লারে – তখন আবার গগনবিদারী স্লোগানে প্রকম্পিত হয় চারদিক, আমাদের ধমনীতে বীরাঙ্গনার রক্ত। আপনাকে আমরা মাথায় করে রাখব। আপনি স্বাধীনতার জন্য লড়াকু বীর নারী। চানবরু চারদিকে তাকায়, ওদের হাতে মোমবাতি। মোমবাতির শিখা জ্বলছে অন্ধকারের বিপরীতে। ওর মনে হয় এই আলো ও একবারই দেখেছিল। দেশ স্বাধীনের দিন। আলোর মাঝে শুধু অন্ধকার ছিল ওর নিজের শরীরে। আজ এত বছর পরে ওর চারদিকে শুধুই আলো – অলৌকিক আলো। এই জীবনে ওর এমন আলো দেখা হবে তা ও ভাবেনি। দূর থেকে ভেসে আসে গান। চানবরুর মনে হয় নত হয়ে আসছে আকাশ। চারদিকে তাকিয়ে ওর ভাবতে ভালো লাগছে যে, বেহেশত বোধ হয় এমনই সুন্দর!

স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মাত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তাহলে কেমন ছির সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি
তাহলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?

জানি, সেদিনের সব স্মৃতি, মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ... ।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প
সেই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, –এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখন্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দুর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মত শিশু পাতা কুড়ানীরা দল বেঁধে।
এই কবিতা পড়া হবে, তার জন্যে কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের: 'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষ,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

সেই দুঃসময়

নাসির আহমেদ

আরণ্যক এই পথে যেতে যেতে মনে পড়ে আজো
বুলেটবৃষ্টির স্মৃতি, সেই যে তুমুল যুদ্ধদিন
দুই সহোদর ওরা কলেজপড়ুয়া, বয়স আঠারো-উনিশ
সুন্দরের কী অপূর্ব সাহস রক্তের ফুল হয়ে ফুটেছিল!

হাওয়ায় হাওয়ায় কাঁপা গাছের পাতারা সেই স্মৃতি
এখনো বহন করে গেয়ে যাচ্ছে বিষাদসংগীত ঝিরিঝিরি
বাঁশঝাড়ে যেন সেই বুলেটবৃষ্টির ঝড় ঘুমিয়ে রয়েছে
জীবনবিনাশী সেই হিংস্র শকুনের সঙ্গে আজো যুদ্ধে আছি!

এই সব পথঘাট পাড়ি দিতে দিতে মনে পড়ে
হিংস্র বাঘের চেয়ে নৃশংস ঘাতকের মুখ
অন্ধকার নিয়ে যারা ছড়িয়ে পড়েছে এই সোনার বাংলায়
সাপিনীরা সরসর শব্দ তুলে হাঁটে আজও পবিত্র ভূমিতে!

মনে পড়ে দুঃসময়– মনে পড়ে সুসময়, আশ্চর্য সময়
সেই মার্চ একাত্তর, সেই যে যুদ্ধের কোনো তুলনা কি হয়!

মন

জাকির আবু জাফর

মনের কথা মনেই থেকে যায়
মনই কেবল মনকে ডেকে যায়
মনের কথা যায় না বলা মুখে
মনের কথা মনেই মরে দুখে

মনকে নিয়ে সারাজীবন জ্বালা
মন দরজায় আছে গোপন তালা
তালার চাবি কোন ভুবনে হায়
মনটা কেবল মনের চাবি চায়

গোপন কথা বহন করে মন
এটাই মনের গোপন জ্বালাতন
কেউ কি জানে এই গোপনের নাম
জানলে হবে দুঃসহ বদনাম

চোখ শরমের ভয়ে সবই কাত
মনের জন্য কে খোয়াবে জাত
মনের দুঃখ তাইতো পোষে মন
কেউ বোঝে না মনের জ্বালাতন
মনের দুঃখে মন হয়ে যায় ভার
মন আগুনে সব পুড়ে ছারখার
তবু মনই মনের মায়া মাখে
গোপন কথা গোপন করে রাখে
মন কখনো হয় না মনের মতো
মন কেঁদে যায় মনেই অবিরত

জগৎ জুড়ে মনকে মনই চায়
মনের দিকে মনই হাত বাড়ায়
মন শোনে না তবু মনের ডাক
মনের কথা মনেই থেকে যাক
মনের কথা মনই কেবল জানে
মন ছাড়া কে মনকে মহৎ মানে।

শিরোনামহীন

জুননু রাইন

সন্ধ্যার মেঘলা বাতাসে কুপির আলোয় নিভে যেতে চাইব
ঈশ্বরের দাওয়ায় বসে থাকব অনেকগুলো একাকিত্ব
মন্দিরে ধুপের গন্ধে পরিচিত অচেনায় বুড়োর শিশুহাসি হাসব।

তখন তুমি যদি জোছনায় মুখ ধুতে চাও–
গভীর রাতের শরীর বেয়ে আমার হাসির রক্ত নেমে পড়বে
তোমার আঁজলায়, চোখের সমুদ্র চেয়ে থাকবে জীবনের অপেক্ষায়।

অথচ তুমি খুব আস্তে আস্তে হাঁটো
হৃদয়ে তোমার নিঃসঙ্গ দুপুরের অর্থ গাঁথো
জানো তো দুপুর খুব হন্তারক
আমার নিরীহ পাখির ডাকগুলো শুষ্ক করে দেয়।

পদ্মাপাড়ের কিংবদন্তি (১৬০০ বঙ্গাব্দ)

কনক চৌধুরী

মুড়ি-মুড়কি-নাড়ু ব্যাগে ঢুকিয়ে মা বলেছিল,
পথে দেরি হলে মনে করে খেয়ে নিস খোকা
আর পৌঁছেই কাউকে দিয়ে রায়দের আড়তে খবর দিস
তোর বাবা বাড়ি ফেরার পথে খবরটা নিয়ে আসবে।

ছেলে বাড়ি থেকে পা বাড়াতেই মায়ের দুশ্চিন্তা শুরু
মায়ের সব থেকে ভয় এই দুর্বোধ্য প্রমত্তা পদ্মাকে নিয়ে
কখনো শান্ত কখনো অশান্ত
কখনো সদয় কখনো সর্বনাশা।

সেদিন গন্তব্যে পৌঁছাতে খোকার অনেক রাত হয়ে যায়
মাকে আর পৌঁছানোর খবর দেওয়া হয় না।

তুমি কি পথিক! তুমি কি ঘোড়সওয়ার! তুমি কি পথযাত্রী!
ক্ষণিক দাঁড়াও। শুনে যাও ১৪০০ সালের কিংবদন্তিখানি

ছাড়িয়েছে ইতিহাস, হারিয়েছে সময়
কত বসন্ত হয়েছে গত, কত বর্ষা হয়েছে সারা
কত গোলাপ ফুটেছে, বকুল ফুটেছে, ফুটেছে কৃষ্ণচূড়া
কত শুকিয়েছে মালা হয়ে, কত গেছে অনাদরে ঝরে
তারপরও থেমে থাকেনি বাংলার পথচলায় জয়যাত্রা
তৈরি হয় বাংলার বাঁক নেওয়া পথে শতবর্ষ আগামীর স্বপ্ন পদ্মপুল
যেন রূপসী বাংলার কণ্ঠে রুপোর হার
এ যেন উত্তর আর দক্ষিণকে সুতো দিয়ে সেলাই
যেন পূর্ব আর পশ্চিম আকাশকে কাছে ডাকা।

বাংলার ইতিহাসে এক টার্নিং পয়েন্ট
এ যেন পাশ্চাত্যের কাছে বঙ্গের আত্মমর্যাদা ঘোষণা।

শতবর্ষ আগামীর আগাম স্বপ্ন দেখে এ বঙ্গবাসী।
একদিন বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে দেখিয়েছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন
তারপর তাঁরই সুযোগ্য কন্যা পদ্মাপুল করে দিয়ে গেছে
শতবর্ষ আগামীর কল্পনাকে বাঙালির হাতের মুঠোয়।

তুমি কি পথিক! তুমি কি ঘোড়সওয়ার! তুমি কি পথযাত্রী!
ক্ষণিক দাঁড়াও! শুনে যাও কিংবদন্তিখানির বাকি অংশটুকু।

এরই মাঝে শতবর্ষ হয়েছে গত
আমি আজ ১৪০০ সালের কিংবদন্তির কথা বলছি।
আমি সেই খোকার কথা বলছি!
তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকার হাসুমণির কথা বলছি!
আমি বাংলার সেই আদুরে মেয়েটির কথা বলছি!

জন্মের নিয়মে সেই খোকা চিরদিন বেঁচে থাকেনি
কিন্তু সে যে একদিন এ বাংলাকে বড়ো ভালোবেসেছিল।

একটি ভাষণ

সাঈদ তপু

একটি ভাষণ বদলে দিল দৃশ্যপট
একটি ভাষণ খুলল দুয়ার অকপট
একটি ভাষণ তুলল ধরে চিত্রসব
একটি ভাষণ স্বাধীন, স্বাধীন উঠল রব
একটি ভাষণ একটি জাতির কণ্ঠস্বর
একটি ভাষণ দেয় ভুলিয়ে আপন-পর
একটি ভাষণ সব বাঙালির ঐকমত্য
একটি ভাষণ অত্যাচারের বিবরণ
একটি ভাষণ রক্তে জাগায় শিহরণ
একটি ভাষণ মাটির সাথে আলিঙ্গন
একটি ভাষণ দলে দলে রণাঙ্গন
একটি ভাষণ শত্রুর আসন কাঁপিয়ে দেয়
একটি ভাষণ বজ্রপাতের আলোর ন্যায়
একটি ভাষণ সিথানে তাঁর কোমল মাটি
একটি ভাষণ পৈথানেতে শত্রুঘাঁটি
একটি ভাষণ বীর বাঙালির জয়োল্লাস
একটি ভাষণ পাক শাসনের সর্বনাশ
একটি ভাষণ সকল বাধা করল জয়
একটি ভাষণ সবকিছুকে করল জয়
একটি ভাষণ ছুটল মহাকালের দিক
একটি ভাষণ উঠল হয়ে অলৌকিক
একটি ভাষণ মাটির কাছে অঙ্গীকার
একটি ভাষণ দেশ-জনতা সঙ্গী তাঁর
একটি ভাষণ মাটি ফুঁড়ে উঠল তেজে
একটি ভাষণ মহাকালের নায়ক সে যে
একটি ভাষণ রক্তে আঁকা প্রান্তর
একটি ভাষণ হাজার ভাষায় রূপান্তর
একটি ভাষণ অগ্নিঝরা জিয়নকাঠি
একটি ভাষণ গুঁড়িয়ে দিল দুর্গঘাঁটি
একটি ভাষণ শিকল ভাঙার জয়গান
একটি ভাষণ বাঁচায় মাটি, বাঁচায় মান
একটি ভাষণ বাংলাদেশের অভ্যুদয়
একটি ভাষণ একাত্তরের যুদ্ধে জয়
একটি ভাষণ একটি স্বাধীন পতাকা
একটি ভাষণ লাল-সবুজে রং মাখা
একটি ভাষণ শ্রেষ্ঠত্বের কারুকাজ
একটি ভাষণ ঐতিহাসিক দলিল আজ।

কপোলের তিল

সাদিয়া সুলতানা

সেদিন মাঝরাতে জোসনায় মুখ ধুয়ে কী নির্ঘুম
সকাল পার করে দিয়ে, বলেছিলে–
তোমার কপোলের তিল, কী অপরূপ ঝলকে ওঠে
সোনালি রোদে। শূন্য মাঠ আর কুয়াশার চাদরে
ঢাকা পড়ে গাঁয়ের পাশের নদীটি। আমি নদী দেখি
একবার, কপোলের তিল দেখি শতবার।
হেমন্তের সিন্নি বানানোর অঘোষিত উৎসবে
ধান মাড়াইয়ের শব্দে, যখন জেগে ওঠে সমস্ত পাড়া
সব মিলে আমার স্বপ্ন, ভালোবাসা আর
জীবন আলস্য-পূর্ণতা-বিষাদে করুণামাখা লাবণ্যময়ী তুমি
এ জীবনের মঙ্গা ঘোচানোর আরেক নাম
তোমার কপোলের তিল।

শেষ মঞ্জিল

রুস্তম আলী

আসতে না আসতে তো জীবনটা কেটে গেল।
কী পেলাম দুনিয়াতে–
কিছুই না!

অচিনপুরে যেতেই হবে–
নৌকা বাঁধা ঘাটে।
টিকিট কাটা হাতে।

শেষ মঞ্জিল তো মানুষের একটাই।
শেষ ভরসা তো–
নামাজের আলো, খোদাভীতি
ঈমান ও তাকওয়া।

শেষ মঞ্জিল পথভ্রষ্টদের হবে–
কালো রঙের ধোঁয়ায় গহীন অন্ধকারে।
সাপ, বিচ্ছু আর পোকামাকড়ে
মগজ খাবে গিলে।

যাহারা সৃষ্টির নৈপুণ্যে বিশ্বাসী
অগ্রবর্তী ঈমান আনয়নকারী–
তাদের শেষ মঞ্জিল হবে
চাঁদের আলোর চেয়েও আলোকিত
নেয়ামতে পরিপূর্ণ।
অচিনপুরে থাকবে সুখে-শান্তিতে
অনন্তকাল ধরে।

জীবন ভেলা

শাহনাজ

দেখা হয়েছিল তাদের এক বসন্তের দুপুরে,
একটি স্বর্ণচাপা গাছে দোল খাচ্ছিল দোয়েল।
ঘুঘুও উড়ছিল একটি-দুটি। পদ্মার শাখানদী
বইছিল গাঁয়ের পাশ দিয়ে।
কী বিষন্ন দুপুর!
হায়! কেউ জানে না এই পারে আর ঐপারে
দুজনার জীবনালেখ্য, মাঝখানে বয়ে যাবে
অন্যরকম নদী।

শুধু জপি তারে

মাইন উদ্দিন আহমেদ

তুমি সোজা হেঁটে রাস্তার শেষ মাথায়
মিষ্টির দোকানটিতে যাও
সেখানে আরাম করে বসে যত খুশি
দই-মিষ্টি চেয়ে নিয়ে খাও
দোকানদার যদি পয়সা চায়
তাহলে আমার কথা তাকে বলো
মিষ্টি খেয়ে তুমি সোজা
আমার কাছেই এসো
আমাকে যদি তুমি ব্যস্ত দেখো
শান্ত থেকে তুমি অপেক্ষা কোরো ভাই
তারপর তুমি আমার সেই চিঠি নিয়ে দিও তাকে
বোলো এখনো তোমার আদম
বাংলাদেশে পড়ে আছে
সবাই যখন ভাগ্য নির্মাণের যুদ্ধে লিপ্ত
আমি শুধু জপি তারে...

নির্লজ্জ বাতাসেরা

তাহমিনা বেগম

ঝরাপাতার মতো জীর্ণতা আজ আমার মাঝেও
ধূসর ঘোলাটে চোখে চেয়ে থাকি
ভালোবাসার রং-তুলিও মলিন
ইজেলে যত চেষ্টা করি তুলির আঁচড়ে
তোমার সাথে রঙিন স্মৃতিগুলো আঁকতে
বড়োই বিবর্ণ হয়ে ধরা দেয় আসে না কিছুতেই রং।

এবড়ো থেবড়ো কোথাও বন্ধুর কোথাও সুদূর
পরাজিত সৈনিক আজ হাহাকার আর হাহাকার
বিলাপে পাপড়ি থেকে অশ্রু নয় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হয়
নির্লজ্জ বাতাসেরা আজ উড়ায় না ধূলিকণা
পাথরের মতো কঠিন শিলালিপি যেন সব।

কাম বাসনার উর্ধ্বে আজ আছে কিছু পোড়া স্মৃতি
অনিমেষ চেয়ে থাকা ছাড়া আর নেই কোনো গন্তব্য
দিগন্ত থেকে দিগন্তে দিকবিদিক শূন্য।

ইতিহাসের রিমোট কন্ট্রোল

জাহানারা জানি

কষ্টের কষ্টিপাথর ঘষে ঘষে
প্রাণগুলো হয় স্বর্ণালি দ্বীপ
সেখানে ইমেটেশনের বাজার বসে না কখনো
বিবেক দিয়েছে খুলে সময়ের হাত
তাই তো আজ মিলাতে হয় সেই
ত্রিশ লক্ষ লাশের হিসাব
কেন বর্ণ ভেদে লিখব তাদের নাম?
বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান নাকি হিন্দু-মুসলমান
ওইসব লাশের স্তূপ থেকে জন্ম আমার একাত্তরে
মায়ের প্রথম চুম্বন পেয়েছি সেদিন
মৃত্তিকার মমত্বের মধুময় ঘ্রাণ
বাবার মতো দু'হাত বাড়িয়ে
আশীর্বাদের আলিঙ্গনে অভিসিক্ত করেছিল
অদূর অদৃশ্য থেকে এক বর্তমানের ষোল কোটি হাত
পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের এক অপরূপ
মানচিত্র দুলিয়ে দুলিয়ে তারা আমাকে
অভিনন্দিত করেছিল সুস্বাগতম সুস্বাগতম।

থমকে আছে জীবন

বোরহান মাসুদ

একটা জায়গায় থমকে আছে জীবন
অন্ধকার শেষ হলে আলো এসে ভেড়ে
আবার আলো শেষ হলে অন্ধকার এসে ভেড়ে
সুখ আর ক্লান্তির ভেতরে জীবনটা স্তব্ধ হয়ে আছে।
আমি ঘরে অথচ বাহিরে ছড়াচ্ছে স্মৃতির ঘ্রাণ
প্রতিনিয়ত আমায় ঘিরে ধরে
কাকের ঝাঁকের মতো অশুভ্র ডানার ছায়া।
কখনো কখনো অন্ধকারের অতঙ্কে মাঝে
আশ্চর্য আর মারাত্মক দুঃসময়ের মুখোমুখী।
আজ পাহাড় চূড়ায় নতুন আশার আলোয়
স্বপ্ন দেখে দেখে এভাবেই সময় পার করি।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য বাহিনী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২ নভেম্বর ২০১৭ রাজশাহী সেনানিবাসে শহিদ আনিস প্যারেড গ্রাউন্ডে ১ প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে ন্যাশনাল স্টান্ডার্ড (জাতীয় পতাকা) প্রদান অনুষ্ঠানে প্যারেড পরিদর্শন করেন –পিআইডি

২ নভেম্বর রাজশাহী সেনানিবাসে এক প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়নের জাতীয় পতাকা প্রদান উপলক্ষে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের আলোকে সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সেনাবাহিনী আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য বাহিনী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছে।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, সেনাবাহিনী গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে 'অপারেশন থান্ডারবোল্ট' পরিচালনা করে নিজেদের কোনো ক্ষতি ছাড়াই এক প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ১৩ জন দেশি-বিদেশি নাগরিককে উদ্ধার করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। সিলেটের আতিয়া মহলেও সাহসিকতার সঙ্গে 'অপারেশন টোয়াইলাইট' পরিচালনা করেছে।

তিনি বলেন, জঙ্গিবাদ এখন বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি। এ অবস্থায় প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

জনগণের কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়ার আহ্বান

১৮ নভেম্বর ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক। তাই আপনাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে জনগণের কল্যাণকে প্রাধান্য দিতে হবে।

তিনি বলেন, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সরকার চলে, আপনাদের সংসার চলে। কর্মক্ষেত্রে যে সার্ভিস দেন, তা জনগণের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দান বা দয়া নয়।

বর্তমান সরকার দেশ, জনগণের কল্যাণে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আপনারা অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন বলে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি।

তিনি আরো বলেন, সরকারের নীতিনির্ধারণী কর্মকাণ্ডেও আপনাদের সহায়ক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গতিশীলতা আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সব ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। যেখানে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই এক সুতোয়, এক প্রাণে গাঁথা। বাংলার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সকলের বিচরণের অভয়ারণ্য। আমি আশা করি, সম্প্রীতির এই আবহমান ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে নিরন্তর কাজ করে যাবে অফিসার্স ক্লাব।

দেশের কৃষ্টি, সভ্যতা, ইতিহাস, ঐতিহ্যগুলো যাতে আমাদের প্রজন্মের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। মানবহিতৈষী কর্মকাণ্ডকে আরো সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

নারী অভিবাসীদের কল্যাণে আইনের খসড়া অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ নভেম্বর তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নারী অভিবাসীদের কল্যাণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার বিধান যুক্ত করে 'ওয়েজ আর্নার্স বোর্ড আইন ২০১৭'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেন।

শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা সমাধানের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ নভেম্বর শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সাভারের চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনে নতুন প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি দ্রুত বর্জ্য শোধনাগার চালুর জন্যও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। বৈঠকে ৪ হাজার ৯৭৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ব্যয়ে মোট ৮ প্রকল্পের অনুমোদন দেন।

স্বাধীনতা স্তম্ভের মূল নকশার অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ নভেম্বর গণভবনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উদীয়মান স্বাধীনতা স্তম্ভের মূল নকশার অনুমোদন দেন। এছাড়া শিশু পার্ককে স্বাধীনতা স্তম্ভ প্রকল্পের আওতায় রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

খুলনা-কলকাতা ট্রেন সার্ভিস এবং ভৈরব-তিতাস রেলসেতুর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৯ নভেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যৌথভাবে খুলনা-কলকাতা ট্রেন সার্ভিস 'বন্ধন এক্সপ্রেস' এবং ঢাকার সঙ্গে সিলেট ও চট্টগ্রামের সংযোগকারী 'ভৈরব ও তিতাস রেলসেতুর' উদ্‌বোধন করেন। তাঁদের সঙ্গে ভারতের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও ছিলেন। তাঁরা একই সঙ্গে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের উভয় প্রান্তের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ নভেম্বর ২০১৭ তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন –পিআইডি

বহিরাগমন ও কাস্টমস কার্যক্রমও উদ্‌বোধন করেন। এ সময় প্রতিবেশী দেশগুলোর বন্ধন আরো জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়াকে শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার লক্ষ্যে ভারতসহ অন্যান্য নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে চান।

আবহাওয়া আইনের খসড়া অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ নভেম্বর তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী 'আবহাওয়া আইন ২০১৭'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। এছাড়া বৈঠকের আগে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের বিশ্লেষণ নিয়ে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী গ্রন্থটির ডিজিটাল ভার্সন ই-বুক ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনও উদ্‌বোধন করেন। গ্রন্থটির মুখবন্ধ রচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

একনেকে ১০ প্রকল্প অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ নভেম্বর শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বরিশালে 'শেখ হাসিনা সেনানিবাস' নামে একটি নতুন সেনানিবাসসহ মোট ১০ প্রকল্পের অনুমোদন দেন। সেনানিবাসটি বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার মধ্যবর্তী স্থান লেবুখালীতে স্থাপন করা হবে।

এনজিও কার্যক্রম নজরদারি করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ নভেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ পরিচালিত এনজিওগুলোর সব ধরনের কার্যক্রম নজরদারি করার নির্দেশ দেন।

সশস্ত্রবাহিনীকে অত্যাধুনিক বাহিনীতে পরিণত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ নভেম্বর 'সশস্ত্রবাহিনী দিবস ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সব ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। তিনি বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সশস্ত্রবাহিনীকে অত্যাধুনিক বাহিনীতে পরিণত করা হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত সশস্ত্রবাহিনী আমাদের জাতির অহংকার।' তিনি সশস্ত্রবাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং এ বাহিনীর জন্য যা যা দরকার তা করা হবে বলে উল্লেখ করেন। **প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম**

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

চীন ও বাংলাদেশের পথসঙ্গী গণমাধ্যম

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৭ নভেম্বর ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে চীন আন্তর্জাতিক বেতার (চায়না রেডিও ইন্টারন্যাশনাল, সিআরআই) ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যৌথ আয়োজনে 'চীনা ও বাংলাদেশিদের ক্যামেরায় সুন্দর মুহূর্ত আলোকচিত্র প্রদর্শনী' এবং 'চীনা চলচ্চিত্র সপ্তাহ' উদ্‌বোধনকালে বলেন, চীন ও বাংলাদেশের দারিদ্র্য উচ্ছেদের সংগ্রাম ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা রাখবে গণমাধ্যম।

মন্ত্রী এ সময় প্রেসিডেন্ট জিনপিং-কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, চীনের প্রেসিডেন্ট ২০০০ সালের মধ্যে সে-দেশের দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও সমৃদ্ধি অর্জনের পরিকল্পনা নিয়েছেন, তা দেখে বাংলাদেশ অনুপ্রাণিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৭ নভেম্বর ২০১৭ জাতীয় জাদুঘরে 'চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী বছর ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত চীনা চলচ্চিত্র সপ্তাহের উদ্‌বোধন করেন এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন –পিআইডি

বাংলাদেশের বৈষম্যহীন সমৃদ্ধির পথে যাত্রার অভিজ্ঞতাও চীনের সাথে ভাগ করে নেওয়া সম্ভব।

আঞ্চলিক সহযোগিতা তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বে দেশকে এগিয়ে নেবে

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৮ নভেম্বর তাঁর হেয়ার রোডের বাসভবনে এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টারের (এপনিক) মহাপরিচালক পল উইলসনের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় তিনি বলেন, আঞ্চলিক সহযোগিতা তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বে দেশকে এগিয়ে নেবে। তিনি এ অঞ্চলে ইন্টারনেটের প্রসার ও ব্যবহারিক আধুনিকায়নে এপনিক-এর কাজের প্রশংসা করেন। তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে দ্রুত উত্তরিত হচ্ছে। আর ডিজিটাল জগতের স্বচ্ছ ঘরে রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং নারী ও শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় সকলের সমন্বিত ভূমিকা প্রয়োজন।

নবান্নের দিন নিজের মনকে আলোকিত করার দিন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৫ নভেম্বর রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া স্টুডিওতে আয়োজিত দিনব্যাপী নবান্ন উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, নবান্নের দিন নিজের মনকে আলোকিত করার দিন। সোনার ধান ফলানো কৃষকের জন্য মমতা, উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, নারীর অগ্রযাত্রা, ডিজিটাল বাংলাদেশ আর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আলোয় আলোকিত হবার সময় আজ।

তিনি এ সময় সকলকে বিশেষ করে দেশের কৃষকদের প্রতি নবান্নের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, নতুন ধানের মৌ মৌ গন্ধে বাংলার গ্রাম-প্রান্তর আজ যে নবান্ন উৎসবে মেতেছে, তার পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান বাংলার কৃষকদের। নবান্ন উৎসবকে দেশের লোকজ সংস্কৃতির অংশ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কৃষকের যাপিত জীবন, সবুজমাখা প্রকৃতির বৈচিত্র্য আর নদীনালা, খালবিলের জলতরঙ্গ – এসবই আমাদের লোকজ সংস্কৃতির উৎস। **প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন**

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

জাতীয় যুব দিবস পালিত

১ নভেম্বর : সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'জাতীয় যুব দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, 'যুবদের জাগরণ, বাংলাদেশের উন্নয়ন'।

যুব দিবসের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি

❑ জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কাজে আত্মতুষ্টিতে না ভোগার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

আয়কর মেলা

❑ 'আমরা স্বাবলম্বী হব, সকলে কর দেব'– স্লোগানে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সাত দিনব্যাপী আয়কর মেলা।

ঢাকায় সিপিএ সম্মেলন

❑ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের সংসদীয় গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ দ্বিতীয় ফোরাম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) ৬৩তম সম্মেলন। 'কনটিনিউয়িং টু এনহ্যান্স দ্য হাই স্ট্যান্ডার্ড অব পারফরম্যান্স অব পার্লামেন্টারিয়ানস'–এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ১ থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ৫২টি দেশের ১৮০টি জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদের স্পিকার, ডিপুটি স্পিকার, সংসদ সদস্যসহ পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন।

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু

❑ দেশজুড়ে শুরু হয় 'জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জেডিসি পরীক্ষা।

জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস

২ নভেম্বর : বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস'। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'আমার চক্ষু-রক্তদান, দেখবে ভুবন বাঁচবে প্রাণ'।

জেল হত্যা দিবস পালিত

৩ নভেম্বর : বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে ঐতিহাসিক 'জেল হত্যা দিবস'।

জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

৪ নভেম্বর : 'উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি' – এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে দেশব্যাপী '৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস' উদ্‌যাপিত হয়।

ঢাকায় সিপিসি-র উদ্‌বোধন

৫ নভেম্বর : রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স (সিপিসি)-র উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৬ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড ও চীনের নরিনকো ইন্টারন্যাশনালের যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াটের দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তির খসড়া অনুমোদিত হয়। এছাড়া বৈঠকে 'ওয়েজ আর্নার্স বোর্ড আইন'-এর খসড়া অনুমোদিত হয়।

একনেক সভা

৭ নভেম্বর : এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় চামড়া শিল্পনগরী ঢাকা (তৃতীয় সংশোধিত) প্রকল্পসহ ৪ হাজার ৯৭৯ কোটি টাকার মোট ৮টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস পালিত

৮ নভেম্বর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'আপনার সুরক্ষায় আমরা যত্নবান'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ নভেম্বর ২০১৭ তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন –পিআইডি

মন্ত্রিসভার বৈঠক

১৩ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাকিস্তান আমলের প্রণীত 'দ্য সুগার (রোড ডেভেলপমেন্ট সেজ) অর্ডিন্যান্স ১৯৬০ রহিতের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া বৈঠকে আবহাওয়া অধিদপ্তরকে আইনি কাঠামো দিতে 'আবহাওয়া আইন ২০১৭'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়।

একনেক সভা

১৪ নভেম্বর : এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় শেখ হাসিনা সেনানিবাস' শীর্ষক প্রকল্পসহ ৩ হাজার ৩৩৩ কোটি টাকার মোট ১০টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস।' এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'সকল গর্ভধারণ হোক পরিকল্পিত'

১৬ নভেম্বর :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়ার অ্যান্ড লেদারগুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং স্যো' উদ্‌বোধন করেন।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শুরু

১৯ নভেম্বর : পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক টয়লেট দিবস পালিত

❑ অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক টয়লেট দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'টয়লেট ডে ২০১৭-এর আমাদের অঙ্গীকার, পারফেক্ট হোক টয়লেট ব্যবহার'

মন্ত্রিসভার বৈঠক

২০ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে 'গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন ২০১৭' এবং রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন ২০১৭'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

সশস্ত্রবাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত

২১ নভেম্বর : যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে 'সশাস্ত্রবাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

বিশ্ব টেলিভিশন দিবস পালিত

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব টেলিভিশন দিবস'

৭ মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি : সারা দেশে আনন্দ শোভাযাত্রা

২৫ নভেম্বর : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি উদ্‌যাপনে দেশজুড়ে আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালিত

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, 'নারীর ওপর যৌন সহিংসতা বন্ধ কর, করতে হবে'।

প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রদূত সম্মেলন

২৫ নভেম্বর : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালনরত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও স্থায়ী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে প্রথম-বারের মতো ঢাকায় শুরু হয় দূত সম্মেলন। সোনারগাঁও হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দিনের এ সম্মেলন উদ্‌বোধন করেন।

প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে বাংলাদেশ

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোতে চার বছর ধরে পুরুষ এবং শিশুদের পোশাক রপ্তানিতে সবার উপরে বাংলাদেশ। ইউরোপিয়ান কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছর বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ১ হাজার ৪৯৬ কোটি ইউরো বা ১ লাখ ৪২ হাজার ১৪০ কোটি টাকার পোশাক, টি-শার্ট, পুরুষ বা বাচ্চাদের শার্ট, ট্রাউজার ও সটস প্যান্ট রপ্তানিতে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ।

পঞ্চগড়-দিনাজপুর-নওগাঁ-নাটোর-পাবনা নৌপথে খনন কাজের উদ্‌বোধন

বিগত সরকারগুলোর অযত্ন ও অবহেলায় দেশের অনেক নদী নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা ও খননের কাজ

গতিশীল করেছে। সরকার গত মেয়াদে ১৪টি ড্রেজার কিনেছে। চলতি মেয়াদের আরো ২০টি ড্রেজার কেনার কাজ চলছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে আরো ৫০টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব ড্রেজার দিয়ে নদী খননের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৪০০ কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ নভেম্বর নৌপরিবহণ মন্ত্রী শাজাহান খান পঞ্চগড়-দিনাজপুর-নওগাঁ-নাটোর-পাবনা নৌপথের খনন কাজের উদ্‌বোধন করেন।

নৌপথটির খনন হলে বাঘাবাড়ী নদীবন্দরের সাথে নওগাঁ, নাটোর, পাবনা জেলার নৌ-পথে সরাসরি নৌ-যোগাযোগ এবং সহজলভ্য পরিবহণ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন থাকবে। নৌপথটি ৮০ ফুট প্রশস্ত ও ৮ ফুট গভীরতায় খনন করা হবে। এতে সারা বছর 'পঞ্চগড়-দিনাজপুর-নওগাঁ-নাটোর-পাবনা' নৌপথটি ২৪৪ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট নৌপথ হবে।

এছাড়া সরকার সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩টি নৌপথ খননের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নদীর নাব্যতা, রক্ষা, দখল ও দূষণরোধে 'টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়েছে। নদী তীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে বিভিন্ন স্থানে 'ইকোপার্ক' নির্মাণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের সাউথ কন্টেইনার ইয়ার্ড উদ্‌বোধন

চট্টগ্রাম বন্দরের গতিশীলতা আনয়ন ও অপারেশনাল কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯ নভেম্বর নৌমন্ত্রী শাজাহান খান নবনির্মিত সাউথ কন্টেইনার ইয়ার্ড উদ্‌বোধন করেন। সাউথ কন্টেইনার ইয়ার্ডটি নির্মাণে ৪৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। দেশের অর্থনীতির প্রাণপ্রবাহ চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আগের তুলনায় বন্দরের সক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর লয়েডস্ লিস্টে ১৬ ধাপ এগিয়ে ৭১তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। **প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ**

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

আবুজায় ডি-৮ শিল্পমন্ত্রী সম্মেলন

ডি-৮ সদস্যভুক্ত দেশগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে একটি 'বিশেষায়িত এসএমই উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র (Dedicated SME Development & Research Center)' স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এসএমই খাতে বিরাজমান বিপুল সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর দ্রুত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এলক্ষ্যে তিনি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে এসএমই খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে দ্রুত সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের পরামর্শ দেন।

নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজার ট্রান্সকোভার হিলটন হোটেলে ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ ডি-৮ শিল্পমন্ত্রী সম্মেলনের (6th Ministerial Meeting on D-8 Industrial Cooperation) Ministerial Plannary session-এ বক্তৃতাকালে শিল্পমন্ত্রী এ প্রস্তাব দেন।

বাংলাদেশ ছাড়াও তুরস্ক, মিশর, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়ার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রিবর্গ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় নাইজেরিয়ার শিল্প, বাণিজ্য ও বিনিয়োগমন্ত্রী ড. অকেচুকু এনেলামাহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৫৮ দেশে নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিশ্বের ৫৮ দেশে নিয়োজিত বাংলাদেশের মিশন প্রধানদের নিয়ে ২৭ নভেম্বর রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় দূত সম্মেলন। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়– 'মানুষ ও শান্তির জন্য কূটনীতি'। ভিশন-২০২১, পররাষ্ট্র নীতির বর্তমান চ্যালেঞ্জ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন, বাণিজ্য বিনিয়োগ, সমুদ্র অর্থনীতি ও যোগাযোগ, শ্রম অভিবাসন, রোহিঙ্গা সংকট, কনস্যুলার সেবা প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য-এ দূত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে রোহিঙ্গা সমস্যা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে সঠিক ধারণা দিতে রাষ্ট্রদূতদের বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রবাসী সরকারের নীতি ও অবস্থান, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে দূতাবাসগুলোর ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয় এ সম্মেলনে।

সম্মেলনের উদ্‌বোধনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিদেশে আপনারা একেকজন একেকটি বাংলাদেশ। আপনাদের কাজ নিছক চাকরি করা নয়, আরো বড়ো এবং মহান কিছু। দেশের ১৬ কোটি হয়ে আপনারা সেখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন। কাজেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সব সময় দেশের স্বার্থে আপনাদের কাজ করতে হবে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভালো-মন্দ বিষয়ে রাষ্ট্রদূতদের খেয়াল রাখতে বলেন প্রধানমন্ত্রী।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চুক্তি

রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়া বিষয়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে 'রাখাইন রাজ্যের বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ফেরার ব্যবস্থা' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৩ নভেম্বর নেপিদোতে বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলী এবং মিয়ানমারের পক্ষে স্টেট কাউন্সেল দপ্তরের মন্ত্রী তিন সুয়ে চুক্তি সই করেন। বাংলাদেশ ১৯৯২ সালের যৌথ বিবৃতির ভিত্তিতে আগ্রহী না হলেও শেষ পর্যন্ত মিয়ানমারের আগ্রহে সেই বিবৃতি অনুসরণ করেই এবারের চুক্তিটি হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সই হওয়া চুক্তি মেনে চলার ব্যাপার আইনি বাধ্যবাধকতা আছে। এক নজরে চুক্তিগুলো নিম্নরূপ:

- স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে আগ্রহীদের পরিচয় যাচাই সাপেক্ষে প্রত্যাবাসন করবে মিয়ানমার
- পরিচয় যাচাইয়ের ব্যাপারে মিয়ানমারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত
- জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থাকে প্রয়োজনে সম্পৃক্ত করতে রাজি দুই দেশ
- ফিরে যাওয়া রোহিঙ্গাদের সীমিত সময়ের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়স্থলে রাখা হবে
- মিয়ানমারে যাওয়ার পর নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে
- ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া শেষে কোনো দেশ আর নতুন করে আশ্রয় বা নাগরিকত্ব দেবে না।

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

ভালো মানুষ গড়তে মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৫ অক্টোবর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ অডিটোরিয়ামে এক মা সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষকই শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের প্রধান শক্তি ও নিয়ামক। তিনি শিক্ষকদের সততা, নিষ্ঠা ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অভিভাবক মা-বাবাকে সন্তানদের প্রতি বিশেষ যত্ন, লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়া এবং একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীরা কোনোভাবে যেন নেতিবাচক ও সমাজবিরোধী কোনো কাজে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান। তিনি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ‘মা সমাবেশ’ করে মা’দের আরো সচেতন ও উদ্যোগী করে তুলতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, পরিচালনা কমিটিকে বিশেষ অনুরোধ জানান এবং মায়েদের বক্তব্য ও পরামর্শ শুনে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। পরে মন্ত্রী এ স্কুলে একটি স্মার্ট ক্লাসরুম এবং শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব উদ্‌বোধন করেন।

নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করার আহ্বান

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ২৬ অক্টোবর নওগাঁ জেলা স্কুল মাঠে জেলার প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়ে ‘সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় ভাষণকালে মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে মানবজীবনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের তুলে দেওয়া হয় শিক্ষার আলোর জন্য, ভালো মানুষ হিসেবে তাদেরকে তৈরি করার জন্য। তিনি আরো বলেন, ২০২১ ও ২০৪১ সালের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে নিষ্ঠা, দক্ষতা দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করতে হবে। এর ফলে মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা ও দেশাত্মবোধের শিক্ষার মাধ্যমে জাতি দেশের সঠিক নেতৃত্ব পাবে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

শিশুদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ২৭ অক্টোবর নওগাঁ জেলায় বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড প্রি-ক্যাডেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জিলা স্কুল মাঠে ২০১৬ সালের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা ভবিষ্যতে সব কাজে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে উন্নত বিশ্বের কাতারে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে তাদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কোর ভাইস প্রেসিডেন্ট পুনঃনির্বাচিত

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ইউনেস্কোর ৩৯তম সাধারণ সম্মেলনের জন্য পুনরায় ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০১৭-১৯ মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। ৩০ অক্টোবর প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫টি সদস্য রাষ্ট্র ও ১০টি সহযোগী রাষ্ট্রের মন্ত্রী ও সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, সংবাদমাধ্যম এবং এনজিও প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে জবাবদিহির ওপর গুরুত্বারোপ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১ নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে ৩৯তম সাধারণ সম্মেলনে গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৭-১৮-এর ওপর এক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে মন্ত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও বিভিন্ন কর্মপন্থা তুলে ধরে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জবাবদিহির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

খেলাধুলার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জিত হয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ১ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৭’ -এর বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা বিভাগের ফাইনাল খেলার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে মন্ত্রী বলে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মানস গঠনে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই। একটি অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত শিক্ষিত সমাজ গঠনে খেলাধুলাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব তৈরির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

শিশুদের সৃজনশীলতার শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ৮ নভেম্বর বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অডিটোরিয়ামে ‘রূপকথার গল্প বলা প্রতিযোগিতা ২০১৭’-এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে মন্ত্রী বলেন, আজকের শিশু আগামীর সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বদানকারী ও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী। তাই তাদের হতে হবে জ্ঞানী, গুণী ও মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী। মন্ত্রী উন্নত রাষ্ট্রের নেতৃত্বের জন্য শিশুদের সৃজনশীলতার শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানান।

সরকারের নিয়ন্ত্রণে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

এখন থেকে বিদেশি কারিকুলামে পরিচালিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো নিয়মিত মনিটরিং করবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। ১৪ নভেম্বর রাজধানীর ৩০টি স্কুলের প্রধানদের নিয়ে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম এ নির্দেশ দেন।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূলের আশ্বাস

২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূলের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে রাশিয়া, ভারত ও মালদ্বীপ। ১৬ নভেম্বর রাশিয়ার মস্কোর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সাথে বৈঠকে ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগত প্রকাশ নাড্ডা, মালদ্বীপের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ নাজিম ইব্রাহিম এবং রাশিয়ার স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী তাতিয়ানা ইয়াকোভলেভা এই আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বাংলাদেশে শহরাঞ্চলের ঘনবসতিপূর্ণ বস্তিগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জীবনাচরণের কারণে যক্ষ্মার প্রকোপ বেশি ঘটছে। তাই শহরের

বস্তিগুলোতে যক্ষ্মা নির্মূলের জন্য আমরা সম্প্রতি ‘জিরো টিবি’ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সংস্থাও জোরদার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের দৃঢ় সদিচ্ছার কারণে বাংলাদেশ থেকে পোলিও, ধনুষ্টংকার, কলেরা, ম্যালেরিয়ার মতো যক্ষ্মাও ২০৩০ সালের মধ্যে নির্মূল হবে।

৮টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ পুনরায় পরিদর্শনের নির্দেশ

যে কয়টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছিল তার মধ্যে ৮টি কলেজ পুনরায় পরিদর্শন করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ৩০ অক্টোবর সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম-এর সভাপতিত্বে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনা নীতিমালা সংক্রান্ত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে দেশের হাসপাতালগুলোতে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টের শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

কলেজগুলো হলো– ঢাকার আদ্-দ্বীন বসুন্ধরা মেডিক্যাল কলেজ, আশিয়ান মেডিক্যাল কলেজ, সাহাবউদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ, নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, কেয়ার মেডিক্যাল কলেজ, আইচি মেডিক্যাল কলেজ, সাফেনা উইমেন্স ডেন্টাল কলেজ এবং গাজীপুরের সিটি মেডিক্যাল কলেজ।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ১৪ নভেম্বর পালিত হয়েছে ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’। এবারে এর প্রতিপাদ্য ছিল ‘সকল গর্ভধারণ হোক পরিকল্পিত’। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস আক্রান্ত নারীর অর্ধেকের বেশি পরবর্তীতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন। অপরিকল্পিত গর্ভধারণ মা ও শিশুর জন্য যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি গর্ভাবস্থায় মায়ের ডায়াবেটিস শিশুর পরবর্তী জীবনে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। এ বাণী থেকেই উপরের তথ্যগুলো ওঠে এসেছে।

প্রতি ১০০ জন গর্ভবতী নারীর মধ্যে ২০ জন গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, যা পরে টাইপ টু ডায়াবেটিসে রূপান্তরিত হয়। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য বড়ো হুমকি। একমাত্র সচেতনতা ও পরিকল্পিত গর্ভধারণ নারীকে এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে পারে। রাজধানীর বারডেম হাসপাতাল মিলনায়তনে বিশ্ব ডায়াবেটিস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এসব কথা বলেন।

‘হার হেলথ’ সচেতন করছে নারী পোশাককর্মীদের

পোশাক শিল্পকারখানায় ‘হার প্রজেক্ট’ শীর্ষক প্রকল্পের ‘হার হেলথ’ কার্যক্রম স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলছে পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের। মাসিকের কাপড় যে রোদে শুকাতে হয় ‘হার হেলথ’ কার্যক্রম চালুর আগে জানতো ৩২ শতাংশ নারী, এখন সে হার উন্নীত হয়েছে ৬৯ শতাংশে এবং গর্ভকালীন বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞান ২৮ থেকে ৪৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের হার ২৩ থেকে বেড়ে ৭২ শতাংশ হয়েছে। পপুলেশন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে পরিচালিত এক গবেষণায় এ ফলাফল পাওয়া গেছে। সম্প্রতি রাজধানীতে পপুলেশন কাউন্সিল আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিজনেস ফর সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি’র (বিএসআর) মাধ্যমে পোশাক শিল্পে কর্মরত নারীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান, আচরণ ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার ১০টি নির্বাচিত পোশাক কারখানায় ‘হার হেলথ’ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। **প্রতিবেদন : আশরাফ উদ্দিন**

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

হুমায়ূন সাহিত্য পুরস্কার পেলেন দুই গুণী

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর প্রবর্তিত হয়েছে ‘হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার’। এক্সিম ব্যাংকের সহযেগিতায় এ পুরস্কার প্রবর্তন করেছে পাক্ষিক অন্যদিন। সামগ্রিক অবদানের জন্য প্রতিবছর একজন প্রবীণ ও একজন তরুণ কথাসাহিত্যিককে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বছর কথাসাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য হুমায়ূন সাহিত্য পুরস্কার পেলেন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। তরুণ ও নবীন বিভাগে এ পুরস্কার পান মোজাফফর হোসেন। হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন ছিল ১৩ নভেম্বর। ১২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননাপ্রাপ্তদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ইতিহাসের মহানায়কেরা

‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।’ সেই অমর ঘোষণায় গমগম করে জাতীয় নাট্যশালায় সুপরিসর মিলনায়তন। প্রতীকী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চে তর্জনী উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ৭ মার্চ জাতীয় নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হওয়া নাটক ‘মুজিব মানে মুক্তি’র প্রদর্শনীর সময় এমনি দৃশ্য ছিল সেখানে। ‘ইউনিভার্সাল থিয়েটার’-এর আয়োজনে ইতিহাস ভিত্তিক নাটক নিয়ে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসব ‘ইতিহাসের মহানায়কেরা’ চতুর্থ দিনের পরিবেশনা এটি। ১ নভেম্বর উৎসবের উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

লায়লা হাসানের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

সদালাপী, সুহাসিনী লায়লা হাসান সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দীপ্তোজ্জ্বল

ব্যক্তিত্ব। ৭০ বছর পেরিয়ে ৭১-এ পা রেখেছেন ৮ আগস্ট। এই গুণী শিল্পীর ৭০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় 'ছন্দে জীবনানন্দে ৭১-এ পা' শীর্ষক আনন্দ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই নৃত্যের ছন্দে ছন্দে লায়লা হাসানকে মঞ্চে আহ্বান করে নিয়ে আসেন নৃত্যশিল্পীরা। এ অংশটি পরিচালনা করেন শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

লায়লা হাসানকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন ও উপহার তুলে দেন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক সফিউদ্দিন আহমদ ও নৃত্যগুরু আমানুল হক।

শুরু হয় নবম যাত্রা উৎসব

যাত্রাশিল্প হারিয়ে যায়নি। ঢাকার মঞ্চে যাত্রার শিল্পের কদর আছে। যাত্রাশিল্প হারিয়ে যাবে না। এমনই মন্তব্য করেছে যাত্রাশিল্পী শহীদুল্লাহ্। ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় স্টুডিও থিয়েটার মিলনায়তনে শুরু হয় এ উৎসব। এটি চলে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত। **প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা**

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ শুরু হতে যাচ্ছে। জি-টু-জি ভিত্তিতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট এক্সপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১২ হাজার ৫৬৬ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে যানজট বহুলাংশে কমে যাবে। একই সঙ্গে দেশের উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ সুগম হবে।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি একনেক বৈঠকে ঢাকা-আশুলিয়া সড়কের পাশ দিয়ে একটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের জন্য মৌখিকভাবে নির্দেশনা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে প্রস্তাবটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনার (পিপিপি) প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

দরপত্র আহ্বানের দ্বিতীয় দফায় সাতটি প্রস্তাব পাওয়া যায়। পরে চীনা ভাইস মিনিস্টারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফরকারী দল সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী এবং সচিবের সঙ্গে বৈঠক করে প্রকল্পে চীনা সরকারের আশ্বাস দেন।

সূত্র জানায়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০১৩ সালে প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চালানো হয়। প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুরু হয়ে আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া- বাইপাইল হয়ে নবীনগর ইন্টারসেকশন পর্যন্ত মোট ৩৫ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ৬.৩৬ কিলোমিটার র‌্যাম্প নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষানুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৬৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার। বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে সিএমসি গত ২০১৫ সালের আগস্টে ভ্যাট/ ট্যাক্স ব্যতীত ১১২ কোটি ৯৫ লাখ ডলারের বাণিজ্যিক প্রস্তাব দাখিল করে। তবে ফাস্ট ট্রাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি ২৫ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ের বাস্তবায়নের আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় উক্ত বাণিজ্যিক প্রস্তাবের মূল্যায়ন ও নেগোসিয়েশন স্থগিত রেখে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২০১৬ সালের আগস্টে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। সম্ভাব্য সমীক্ষায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ৩.৯৭ কিলোমিটার দীর্ঘ র‌্যাম্প, নবীনগর ইন্টারসেকশনে ৭১০ মিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার বিদ্যমান, ১৫.২৮ কিলোমিটার আশুলিয়া সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং ২.২৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দুটি সেতুসহ ড্রেন নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। **প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলা শেখার এক অন্যরকম প্রয়াস

রেভারেন্ড আর টি ময়া ছাকছুয়াক। তাঁর বাড়ি কোরিয়ায়। একবার বাংলাদেশের পাহাড়ে বেড়াতে এসে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো দেখতে না পেয়ে তাঁর ইচ্ছে হয় সমতলে ক্ষুদ্র জাতির মানুষদের জন্য একটা স্কুল করার। তাই ২০০১ সালে ১৫ বিঘা জমিতে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার ওসমানপুরে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। কোরিয়ায় তাঁর গ্রামের নাম অনুসারে স্কুলের নাম রাখেন তেজন মডেল স্কুল। বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিমেষ চাকমা মনে করেন, বাংলা ভাষায় পড়ালেখা করলে এই শিশুরা বড়ো হয়ে সহজেই চাকরি পেয়ে যাবে। পাহাড়ে বাংলা শিক্ষক খুব কম। তাই বাংলা শিক্ষা নিতে অনেক অভিভাবক শিশুদের এখানে পাঠান।

দ্বিতল ভবনের এই বিদ্যালয়ে ১০টি শ্রেণিকক্ষ, ১১ জন শিক্ষক ও ৯৫ জন শিক্ষার্থী আছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী ৩৬ জন। দুটি আলাদা ছাত্রাবাস আছে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য। নিজেদের জিনিসপত্র সুন্দরভাবে সাজানো সেখানে। হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা বিনামূল্যেই। পড়াশোনার জন্য কোনো বেতনও দিতে হয় না।

যেহেতু শিশুদের মা-বাবা সঙ্গে থাকেন না। তাই তাদের সব দায়িত্ব শিক্ষকদের ওপর। মেয়েশিশুদের শারীরিক পরিবর্তনের সময় পরামর্শ ও সহযোগিতা করেন বড়ো দিদিমণিরা। দিদিমণিরা এখানে থেকেই কলেজে পড়ে। শিশু থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর পর এই শিক্ষার্থীরা চলে যায় স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে। সে খরচও দেয় এই কর্তৃপক্ষ। কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ছোটোদের সহযোগিতা করে ও হাতে-কলমে নানাপ্রকার কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে। তেজন মডেল স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির সুবিধাবঞ্চিত দুর্গম এলাকা থেকে এসেছে। এছাড়া স্থানীয় সাঁওতাল ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুরা এ বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করে। বম, চাক, ম্রো,

খুমি, পাওখোয়া, ওঁরাও, মালো ও সাঁওতাল এই আট গোষ্ঠীর শিশুরা মূলত এই বিদ্যালয়ে পড়ে।

সহকারী শিক্ষক পক্ষ প্রজ্ঞারত্ন চাক বলেন, '২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচ-সাত বছর পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অফিস-আদালত ও হাটবাজারে গেলেই নানা প্রকার মন্তব্য ছুঁড়ে দিত অনেকেই। সুখের কথা হলো, সেসব দিন শেষ। বর্তমানে অনেক সম্মান দেয় এলাকার লোকজন।'

এখন প্রতিদিনই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে থাকে– আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

প্রতিবেদন : মো. মামুন হোসেন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডাক বিভাগের ৩টি পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বাংলাদেশের ডাক বিভাগের পাওয়া তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার হস্তান্তর করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। ২০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকের শুরুতে প্রতিমন্ত্রী পুরস্কারগুলো শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগকে ১৮ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ায় এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পুটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (এএসওসিআইও) '২০১৭ ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' দেয়।

১২ সেপ্টেম্বর তাইওয়ানে ই-এশিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় এশিয়া প্যাসিফিক কাউন্সিল ফর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যান্ড ইলেট্রনিক বিজনেস (এএফএসিটি) বাংলাদেশ 'ডাক বিভাগকে ই-কমার্স সেবা সংশ্লিষ্ট 'পোস্টাল ক্যাশ কার্ড : ব্যাংকিং ফর আনব্যাংকড পিপল'-এর জন্য রানার্সআপ হিসেবে সিলভার অ্যাওয়ার্ড দেয়।

এছাড়া ৯ হাজার ৮৮৬টি ডাকঘরের মধ্যে সাড়ে ৮ হাজার ডাকঘরকে পোস্ট ই- সেন্টারে রূপান্তরের জন্য ১২ সেপ্টেম্বর তাইওয়ানে দ্য ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিস এলায়েন্স বাংলাদেশের ডাক বিভাগকে ডিজিটাল অপরচ্যুনিটি ক্যাটাগরিতে 'ডব্লিউআইটিএসএ মেরিট অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়।

গ্রামীণ নারীদের হাতে যোগাযোগ প্রযুক্তি

শুরু হলো 'তথ্য আপা' প্রকল্পের কাজ। তথ্য আপারা গ্রামের মানুষের ঘরের দুয়ারে যান। তাদের কাছে থাকে সকল রকম তথ্য। গ্রামের কম সুবিধাপ্রাপ্ত নারীদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নসহ পিছিয়ে পড়া নারীদের কর্মমুখী করে তোলা এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। প্রথম পর্যায়ে ১৩ উপজেলায় পাইলট প্রকল্পের সফলতার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশের সব উপজেলায় 'তথ্য আপা' প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটিকে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) অনুমোদন দিয়েছে। 'তথ্য আপা' প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫শ ৪৫ কোটি টাকা। ৫ বছর পর প্রকল্পের সব কর্মসূচির সফলতার ওপর ভিত্তি করে সরকারের এই প্রকল্প মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ নেবে।

প্রকল্প পরিচালক যুগ্ম সচিব মীনা পারভীনের তথ্য মতে, দ্বিতীয় পর্যায়ের 'তথ্য আপা' প্রকল্পে আরো নতুন বিষয় যোগ হয়েছে। এরমধ্যে বড়ো কর্মসূচি ই-কমার্স। এর মাধ্যমে গ্রামীণ নারী নক্‌শিকাঁথাসহ তাদের উৎপাদিত হস্তশিল্প বিপণনের সব তথ্য পাবে। তারা ই-লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দলও গঠন করতে পারবে।

মন খুলে জানান সমস্যা, সমাধান দেবে মায়া আপা

নারীরা মন খুলে সমস্যার কথা বললে সমাধান পাওয়ার জন্য আছে 'মায়া আপা' নামের একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। যার সাহায্যে কেউ সহিংসতার শিকার হলে আইনি সহায়তা, স্বাস্থ্য, মনোসামাজিকসহ সব বিষয়ে পরামর্শ পাচ্ছে এই মোবাইল অ্যাপ থেকে।

মুঠোফোন নাম্বার, ফেসবুক বা ই-মেইলের মাধ্যমে নিবন্ধন করে নিজের নাম-পরিচয় গোপন রেখে প্রশ্ন করা যাবে এই অ্যাপে। ১০ মিনিট থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাওয়া যাবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ। নারীদের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুরুষও এই অ্যাপটি ব্যবহার করছে।

২০১৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এই অ্যাপটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন হয়। ব্র্যাকের অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতায় মায়া ডটকম ডট বিডি (www.maya.com.bd) ওয়েবসাইট তৈরি করেছে এই অ্যাপ। গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড ও ইনস্টল করে চালু করলে মুঠোফোনের পর্দায় অ্যাপটির প্রিমিয়াম সেবার বিষয়ে তথ্য আসবে। **প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি**

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষি সম্প্রসারণ বাতায়ন উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে দেশের ১৪টি কৃষি অঞ্চলে পাইলটিংয়ের জন্য 'কৃষি সম্প্রসারণ বাতায়ন' উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ১ নভেম্বর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্‌বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। কৃষক, কৃষি সংগঠন, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী,

হাটবাজার, সরবরাহ এবং কৃষিকাজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকবে কৃষি সম্প্রসারণ বাতায়নে। কৃষকবান্ধব ডিজিটাল কৃষি সেবা ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের পেশাগত যোগাযোগ ও কারিগরি অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য কাজ করবে এ বাতায়ন। একই সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ সেবার তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হবে এবং কৃষক তার চাহিদা মতো তথ্য পাবে। ফলে কৃষকের সাথে সম্প্রসারণ কর্মীদের সম্পর্ক আরো নিবিড় স্বাচ্ছন্দ্যময় ও বহুমাত্রিক হবে।

এ পাইলট কার্যক্রমের আওতায় যে ১৪টি উপজেলা রয়েছে তা হলো– মানিকগঞ্জের দৌলতপুর, শেরপুরের নকলা, চাঁদপুরের সদর, সিলেটের বালাগঞ্জ, কক্সবাজারের পেকুয়া, রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, রাজশাহীর দূর্গাপুর, সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ, রংপুরের পীরগঞ্জ, পঞ্চগড়ের বোদা, কুষ্টিয়ার মিরপুর, খুলনার রূপসা, পিরোজপুরের নাজিরপুর ও রাজবাড়ির পাংশা উপজেলা। আগামী ডিসেম্বরে সারা দেশে এ 'কৃষি সম্প্রসারণ বাতায়ন'-এর উদ্‌বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষক যেন তথ্য পায় এবং তাদের তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য 'কৃষি সম্প্রসারণ বাতায়ন' চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এখন যে-কোনো অপারেটর থেকে ২৪ ঘণ্টা ১৬৩৪৫ নম্বরে এসএমএস করে যে-কোনো সেবা নিতে পারছেন কৃষক।

কৃষি সেচে সৌরবিদ্যুতের দুই প্রকল্প

ভূগর্ভস্থ সেচের ওপর নির্ভরশীল কৃষি ব্যবস্থায় পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত হচ্ছে বিদ্যুৎ। যার ফলে বেড়ে যাচ্ছে কৃষি উৎপাদন খরচ এবং চাপ বাড়ছে বিদ্যুৎ খাতে। তাই সেচ কাজে সৌর বিদ্যুতের নির্ভরতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে দুটি আলাদা প্রকল্পে আড়াইশ কোটি টাকা ব্যয় করবে সরকার।

সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় হবে ২০৫ কোটি টাকা। এটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)। ৩২টি জেলার নির্বাচিত ১৬৮টি উপজেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ১৫০টি ১-কিউসেক ও ২৫০টি ৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত লো-লিফট পাম্প স্থাপন, ৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন, ৪০০ পাম্প হাউস নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ ২ লাখ ৪০ হাজার মিটার, সৌরশক্তি চালিত পাতকূয়া খনন ৪০০টি, ৬টি অফিস ভবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৫ হাজার ৩২০ হেক্টর জমিতে ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে ২৬ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

অন্যদিকে 'সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বিস্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পে ব্যয় হবে ৩৯ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) এটি বাস্তবায়ন করবে। ৩২টি জেলার ৩৫ স্থানের প্রদর্শনী জমিতে গবেষণা কাজ চালানো হবে। নির্বাচিত প্রতি এলাকায় ৮০ জন কৃষকের উপ-প্রকল্প নেওয়া হবে। প্রত্যেক কৃষককে ২০ হাজার টাকা করে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া হবে।

আটঘরিয়া, ঈশ্বরদী ও শেরপুরে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ

পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলায় ৫৭৪ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ৫ লাখ টাকার কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। ৩ নভেম্বর আটঘরিয়া উপজেলা মিলনায়তনে কৃষি প্রণোদনার আওতায় সরিষা, খেসারি, ভুট্টা ও বিটি বেগুনসহ সার ও বীজ বিনামূল্যে কৃষকদের হাতে তুলে দেন ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ। অন্যদিকে ৪ নভেম্বর ঈশ্বরদী উপজেলা মিলনায়তনে ১ হাজার ৪৫৪ জন কৃষকের মাঝে ১৫ লাখ টাকার কৃষি উপকরণ তুলে দেন ভূমিমন্ত্রী।

বন্যা ও অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি শুরু করেছে শেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। মাষকলাই ও রবিশস্য আবাদ করার জন্য ৯ হাজার ৪২৪ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে প্রয়োজনীয় বীজ ও সার বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে জেলার সব উপজেলায় সরিষা, ভুট্টা, গম, বিটি বেগুন ও মুগ ডালের বীজ ও সার বিতরণ করা হবে বলে জানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এতে ডাল ও তেলজাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কৃষকরাও লাভবান হবে বলে আশা করছে কৃষি বিভাগ। **প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা**

ঢাকার বায়ুদূষণ কমাতে ১১ সুপারিশ

রাজধানীর বায়ুদূষণ কমাতে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের আহ্বান জানিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের চামেলী সভাকক্ষে ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় এই আহ্বান জানানো হয়। সভায় বিভিন্ন সংস্থার জন্য ১১ দফা করণীয় সুপারিশ করা হয়। করণীয়গুলো হলো ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে সনাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর ইটভাটা করা। যানবাহনের কার্বন নিঃসরণমাত্রা পরীক্ষা করে ফিটনেসবিহীন যান চলাচল বন্ধ করা। দীর্ঘ যানজটে আটকে থাকলে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ রাখা। শিল্পকারখানায় মনিটরিং জোরদার করা। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বালু, সিমেন্ট, ইট ইত্যাদি পরিবহণ ও মজুতের সময় ঢেকে রাখা। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি পয়ঃনিষ্কাশন ও টেলিফোন লাইন উন্নয়ন ও মেরামত) সময় ধূলিদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পানি ছিটানো সড়ক নির্মাণ ও মেরামত এবং সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর সমন্বয় সাধন করা। রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির সময় ওই স্থান যতটুকু সম্ভব ঢেকে রাখা ও দিনে একাধিকবার পানি ছিটানো। নিয়মিত রাস্তা পরিচ্ছন্ন ও ধুলা নিয়ন্ত্রণে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করা। উন্মুক্ত স্থানে সবুজায়ন করা এবং আর্বজনা না পোড়ানো। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং ইট প্রস্তুতকারক সমিতি, বেসরকারি আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাব, পরিবহণ মালিক সমিতিকে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে।

সভায় বায়ুদূষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উঠে আসে, শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর থেকে মার্চ) রাজধানীতে বায়ুদূষণের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ সময় বাতাসে ২ দশমিক ৫ মাইক্রোমিটার আকারের বস্তুকণার উপস্থিতি বাড়ে। বস্তুকণা নিশ্বাসের সঙ্গে রক্তে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। রাজধানীতে এই বস্তুকণাজনিত দূষণের ৫৮ ভাগ দায় ইটভাটার, ১৮ ভাগ রাস্তা ও মাটি থেকে তৈরি ধুলা, ১০ ভাগ যানবাহন ও ১৪ ভাগ দায় অন্যান্য উৎসের। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রইছউল আলম মন্ডল বলেন, সবার

সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া শুধু পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। শুষ্ক মৌসুমে রাজধানীতে বায়ুদূষণ কমাতে পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত সভায় বিআরটিএ, সিটি করপোরেশন, ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, সড়ক ও জনপদ বিভাগ, ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির প্রতিনিধিরা অংশ নেন ও দূষণরোধে তাদের অবস্থান তুলে ধরেন। সভায় বায়ুদূষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশমী, পরিচালক জিয়াউল হক, নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (কেস) প্রকল্পের পরিচালক এস.এম. মঞ্জুরুল হান্নান খান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

সততার শীর্ষ তিনে শেখ হাসিনা

বিশ্বের সৎ পাঁচ নেতার তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি পিপলস অ্যান্ড পলিটিকস বিশ্বের পাঁচ সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানকে চিহ্নিত করে তালিকা প্রকাশ করেছে। যাদের কোনো দুর্নীতি স্পর্শ করেনি, যাদের বিদেশে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টও নেই, উল্লেখ করার মতো কোনো সম্পদও নেই।

১৭৩ দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে এই গবেষণা সংস্থাটি। মাত্র ১৭ সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান পেয়েছেন যারা শতকরা ৫০ ভাগ দুর্নীতিমুক্ত হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯০ নম্বর পেয়ে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও সৎ সরকার প্রধান বিবেচিত হয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মেরকেল। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং ৮৮ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন আর ৮৭ নম্বর পেয়ে এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ পক্ষ পালন

প্রতি বছরের মতো এবার ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ পক্ষ। চলবে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। 'কেউই রবে না পিছে: নারী ও মেয়ে শিশুর নির্যাতন মুক্ত জীবন চাই' প্রতিপাদ্য নিয়ে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে ১৬ দিনব্যাপী চলবে প্রচারভিযান, থাকবে নানা আয়োজন। প্রথম দিনে এ উপলক্ষে রবীন্দ্র সরোবরে শহীদ নবী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মার্শাল আর্ট প্রদর্শন করে।

প্রশাসনিক পর্যায়ে নারীর অবস্থান

প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অবস্থান এখন শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখন ডিসি ও ইউএনও'র মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করছেন নারীরা। দেশে ১০৬ জন নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), জনপ্রশাসনে ১০ জন নারী সচিব, ৬ জন জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং ১৬ জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (এডিসি) দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৯ সালে সরকারি চাকরিতে নারী ছিলেন ২ লক্ষ ২৭ হাজার ১১৪ জন। ২০১৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩৫৪ জন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

দেশে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা আছেন ৫ হাজার ৭৫৯ জন। এর মধ্যে প্রায় ১ হাজার ১০০ জনই নারী। দেশে ৪৯১টি উপজেলার ৪২৮টিতে ইউএনও আছেন, যাঁদের মধ্যে নারী ১০৬ জন। যেমন- কিশোরগঞ্জের ১৩টি উপজেলার মধ্যে ৮টিতে, টাঙ্গাইলের ১২ উপজেলার মধ্যে ৮টিতে এবং ময়মনসিংহের ১৩টি উপজেলার মধ্যে ৫টিতে নারী ইউএনও আছেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে এখন ৬ জেলায় নারী প্রশাসক দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া ৮ বিভাগের মধ্যে সিলেট বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্ব পালন করছেন একজন নারী। সারাদেশে ২০৬ জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (এডিসি) মধ্যে ১৬ জন নারী রয়েছেন। ২ নভেম্বর পর্যন্ত সচিব ও সমপর্যায়ের ৭৮টি পদের মধ্যে ১০ জন নারী রয়েছেন। অর্থাৎ মোট সচিবের মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশ নারী।

যমুনা সার কারখানায় প্রথম নারী এমডি

যমুনা সার কারখানায় প্রথমবারের মতো ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মাহবুবা সুলতানা। ১৪ নভেম্বর তিনি এ পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে সহকারী রসায়নবিদ হিসেবে বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থায় (বিসিআইসি) যোগদান করেন। এরপর ১৯৯০ সালে তিনি যমুনা সার কারখানায় যোগ দেন।

বাংলাদেশে নারীর আয় ভারত পাকিস্তান থেকে বেশি

ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের নারীরা বেশি উপার্জন করছেন। ভারতের নারীদের চেয়ে ৮ শতাংশ এবং পাকিস্তানের নারীদের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি আয় করছেন তারা। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) ২০১৬ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে এ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

ক্রয় সক্ষমতা অনুসারে (পিপিপি) বাংলাদেশের নারীদের গড় আয় বছরে এখন ২ হাজার ৩৭৯ ডলার বা ১ লাখ ৯২ হাজার ৬৯৯ টাকা। সেখানে ভারতের নারীদের আয় বছরে ২ হাজার ১৮৪ ডলার বা ১ লাখ ৭৬ হাজার ৯০৪ টাকা। আর পাকিস্তানের নারীরা বছরে ১ হাজার ৪৯৮ ডলার বা ১ লাখ ২১ হাজার ৩৩৮ টাকা আয় করেন।

মাতৃত্বকালীন ভাতার মেয়াদ ৪ বছর হচ্ছে

শূন্য থেকে ৪ বছরের মধ্যে শিশুর ৮০ শতাংশ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধিত হয়। এই সময় মা যদি পুষ্টিকর খাবার না খায় তাহলে শিশু অপুষ্টিতে ভোগে এবং তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধিত হয় না। এই সমস্যা সমাধানে হতদরিদ্র মা'কে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে ২ বছর পর্যন্ত যে ভাতা প্রদান করা হয় এর মেয়াদ বাড়িয়ে ৪ বছর করার চিন্তা করছে সরকার।

১৫ নভেম্বর রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে সামাজিক নিরাপত্তা স্ট্র্যাটিজি বাস্তবায়নে উক্ত মন্ত্রণালয়ের করণীয় বিষয়ক সেমিনারে মহিলা ও

শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এসব কথা বলেন। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার সারা দেশের প্রায় ৮০ লাখ হতদরিদ্র মা'কে এ ভাতা প্রদান করছে। **প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ ও ঐতিহাসিক আম্রকানন

কুষ্টিয়া জেলার একটি মহকুমার নাম ছিল মেহেরপুর। ১৯৮৪ সালে মেহেরপুর জেলায় উন্নীত হয়েছে। মেহেরপুরের নামকরণে রয়েছে নানা মত। কেউ বলেন, ষোলো শতকে মেহেরুল্লাহ নামে একজন সমাজহিতৈষীর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। আবার কেউ

বলেন, বিখ্যাত সাধক ও সমাজসংস্কারক মুন্সি মেহেরুল্লাহর নামানুসারে এ অঞ্চলের নামকরণ করা হয় মেহেরপুর। তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননের ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) শপথ গ্রহণ করে। সেদিন থেকে বৈদ্যনাথতলা 'মুজিবনগর' নাম ধারণ করেই বাংলার ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে আছে। আর এই শপথ গ্রহণের মাধ্যমে জন্ম হয় একটি জাতি- রাষ্ট্রের– যার নাম বাংলাদেশ। মুজিবনগরের এই ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা স্মরণীয় করে রাখার জন্য শপথ গ্রহণের স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে 'মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ'।

স্থপতি তানভীর করিম ১৯৮৫ সালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং পরের বছর তা সমাপ্ত হয়। ১৯৮৭ সালে ১৭ এপ্রিল তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান এর উদ্‌বোধন করেন। স্মৃতিসৌধের প্রতিটি অংশ একটি বিশেষ বার্তা বহন করে। ১৬০ ফুট ব্যাসের গোলাকার স্তম্ভের ওপর মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের বিভিন্ন অবয়ব নির্মিত। ভারত ভাগের পর ২৩ বছর পাকিস্তানের শাসনাধীন ছিল এ দেশ। তাই ২৩টি ত্রিকোণ কংক্রিটের দেয়ালের সমন্বয়ে উদীয়মান সূর্যের প্রতিকৃতিকে পটভূমি করে নির্মিত হয়েছে মুজিবনগর সরকার। গোলাকার স্তম্ভের অর্ধেকের ওপর বেদিকে কেন্দ্র করে দেয়ালগুলো দণ্ডায়মান। সমকোণী দেয়ালগুলো ডানদিক থেকে বামদিকে ক্রমশ আকারে বড়ো হয়েছে– যা আমাদের প্রতিরোধের ক্রম তীব্রতা প্রকাশক। ত্রিভুজ আকারের প্রথম দেয়ালটির উচ্চতা ৯ ফুট আর দৈর্ঘ্য ২০ ফুট। পরবর্তী প্রতিটি দেয়ালের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে ৯ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্যে ১ ফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে ২৩তম দেয়ালের উচ্চতা হয়েছে ২৫ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট। গোলাকার বেদিটি ভূমি থেকে ৩টি স্তরে ৩টি ভিন্ন উচ্চতায় ৩টি চত্বরে বিভক্ত। এই স্তরগুলো ৭ মার্চ, ২৬ মার্চ এবং ১৭ এপ্রিলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে। একই সাথে '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬৯ -এর গণ-অভ্যুত্থান এবং '৭১- এর মুক্তিযুদ্ধকেও স্তর ৩টি ধারণ করে আছে। ৯টি ধাপ পেরিয়ে প্রথম স্তর শুরু। এই ধাপগুলো মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসকে বুঝানো হয়েছে। ৯টি ধাপ পেরিয়ে ২ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতায় প্রথম বেদি অবস্থিত। সেই বেদিতে গোলাকৃতির অসংখ্য বৃত্ত আছে। সেগুলো দ্বারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরটি আরো ৬ ইঞ্চি উঁচু। সেখানে রয়েছে অসংখ্য নুড়ি পাথর। পাথরগুলো মুক্তিযুদ্ধকালীন সাড়ে ৭ কোটি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী জনতার প্রতীক। যে স্থানে অস্থায়ী সরকার শপথ নিয়েছিল ঐ স্থানটির ঐতিহাসিক তাৎপর্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্মৃতিসৌধের মাঝখানে লাল সিরামিক ইট দিয়ে একটি আয়তক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। এটি ২০ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট প্রশস্ত। অবয়ব থেকে লাল রং দ্বারা পৃথক করে রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতার তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়েছে। স্মৃতিসৌধের বেদিতে আরোহণের জন্য ১১টি সিঁড়ি রয়েছে। যা দ্বারা মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সমগ্র বাংলাদেশকে যে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল তা বোঝানো হয়েছে। এই স্মৃতিসৌধটি স্বাধীনতার জন্য বাঙালির দৃঢ় সংকল্প, সংগ্রাম ও মনোবল একত্র হয়ে চূড়ান্ত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষায় উপস্থাপিত হয়েছে। **প্রতিবেদক : লতা খান**

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

রাজধানীর পূর্ব থেকে পশ্চিমকে সংযুক্ত করবে নতুন উড়াল সড়ক

ঢাকার পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তকে সংযুক্ত করতে ৩৯ দশমিক ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (উড়াল সড়ক) নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মূলত পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হবে।

বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে খুলে দেওয়া হবে পদ্মা সেতু। তখন রাজধানীতে বাড়বে দূরপাল্লার যানবাহনের চাপ। আর এই চাপ সামাল দিতেই প্রস্তাবিত উড়াল সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সেতু বিভাগ সূত্র জানায়, ঢাকা শহরের সড়কগুলো মূলত উত্তর-দক্ষিণে। তাই এবার পূর্ব- পশ্চিমজুড়ে নির্মিত হবে উড়াল সড়ক। সাভার উপজেলার বালিয়াপুর বাসস্ট্যান্ডের অদূরে মধুমতি মডেল টাউনের

কাছে হবে উড়াল সড়কের মূল পয়েন্ট। এখান থেকে একটি অংশ চলে যাবে সাভার- হেমায়েতপুর। অপর অংশটি গিয়ে ঠেকবে পুরান ঢাকার নিমতলী থেকে কেরানীগঞ্জ-ইকুরিয়া-জাজিরা-ফতুল্লা-হাজীগঞ্জ-বন্দর-মদনপুর হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে। মূলত হেমায়েতপুর থেকে সাভার বলিয়াপুর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে এটা মিলিত হবে এই উড়াল সড়কে। এই উড়াল সড়কের মাধ্যমে পদ্মা সেতুর সঙ্গে ঢাকা- আরিচা ও ঢাকা-চট্টগ্রাম দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই দুই মহাসড়কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে।

গণপরিবহণে নৈরাজ্য বন্ধে সুপারিশমালা

গণপরিবহণে শৃঙ্খলা ফেরাতে ১০টি সুপারিশমালা চূড়ান্ত করেছে সিটিং সার্ভিসসহ সুষ্ঠু যাত্রী সেবা কমিটি। এরমধ্যে সিটিং সার্ভিসের ভাড়া ও স্টপেজ নির্ধারণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরো আছে সিটিং ও ননসিটিং গাড়ির রং আলাদা করা। জনসাধারণ যেন দূর থেকেই বুঝতে পারেন গাড়ি সিটিং কি না। এর সঙ্গে সিটিং সার্ভিসের ভাড়া এবং রুট নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। গণপরিবহণের মালিকানা থাকবে চার-পাঁচটি কোম্পানির হাতে। ফলে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো এবং গাদাগাদি করে যাত্রী তোলার দৌরাত্ম্য কমবে। সিটিং সার্ভিসের স্টপেজ আলাদা থাকবে। নির্দিষ্ট স্টপেজ ছাড়া যাত্রী ওঠা-নামা করানো যাবে না। এর সঙ্গে ট্রাভেল কার্ডের সুপারিশ করা হয়েছে। এতে যাত্রী কার্ড রিচার্জ করে বাসে যাতায়াত করতে পারবেন। সুপারিশ অনুযায়ী, গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা লাগানো হবে। এতে কেউ নিয়ম ভঙ্গ করলে বা কোনো অপরাধ করলে তাদের শনাক্ত করে শাস্তির আওতায় আনা যাবে। পথচারী পারাপারে রোডে জেব্রাক্রসিং থাকবে। এছাড়া নতুন কিছু বিআরটিএল ডবল ডেকার নামানোর সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে কম গাড়িতে বেশি যাত্রী পরিবহণ করা যাবে। এর পাশাপাশি প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা কমাতে মানুষকে গণপরিবহণে যাতায়াতে উৎসাহিত করা হবে। **প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন**

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশু বাজেটে ৫৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা

'বিকশিত শিশু : সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' স্লোগান সামনে রেখে চলতি বাজেটে ৫৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এর আওতায় দারিদ্র্যমুক্ত পরিবেশে শিশুর বেড়ে ওঠা, দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পকালীন পুষ্টিহীনতা রোধ, উচ্চ মাধ্যমিকে ঝরে পড়া নিয়ন্ত্রণ, বাল্যবিবাহ, নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধ এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১৩ মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শিশু বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়গুলো কাজ শুরু করেছে। জানা গেছে, দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম অংশের অনুপাত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে ২০৪২ সাল নাগাদ। জনমিতির এই সুবিধার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করতে হলে আজকে যে শিশু জন্মগ্রহণ করবে তার দিকে সবচেয়ে বেশি যত্নবান হতে হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের জাতির কাণ্ডারি। তাই এ সময় থেকেই তাদের গড়ে উঠতে হবে। শিশু উন্নয়নে পদক্ষেপগুলোর মধ্যে শিশু আইন ২০১৩ এবং জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অন্যতম। এছাড়া জাতিসংঘের কনভেনশন অন রাইটস অব চিলড্রেন অনুমোদন দিয়েছে বর্তমান সরকার।

আর্জেন্টিনায় বিশ্ব শিশুশ্রম সম্মেলনে শ্রম প্রতিমন্ত্রী

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, শিশুশ্রম শুধু শিশুদের ন্যায্য মানবাধিকার থেকে বঞ্চিতই করে না, দেশের সার্বিক উন্নয়নেও বিঘ্ন ঘটায়। তিনি ১৫ নভেম্বর আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আয়ারসে চতুর্থ বিশ্ব শিশুশ্রম সম্মেলনে বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোনো শিশু শ্রমিক নেই। এখন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শিশুদের শ্রম থেকে ফেরানোই বড়ো চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা– এসডিজিকে সামনে রেখে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে সব রকমের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ আইএলও-এর ৭টি কোর কনভেনশনসহ ৩৫টি কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেছে, যার মধ্যে শিশুশ্রম বিষয়ক কনভেনশনও রয়েছে। শ্রম আইনে ১৪ বছরের নিচে শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শ্রম আইনে বলা হয়েছে, ১৪ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন কাজ করতে পারবে। একই সাথে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শের আলোকে ৩৮টি সেক্টরকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। গৃহকর্ম থেকে শিশুদের রক্ষায় সরকার ২০১৫ সালে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতায় ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রমমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব হবে বলে প্রতিমন্ত্রী আশাবাদ প্রকাশ করেন।

৪ দিনের এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শেষ দিনে ১৭ নভেম্বর অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশের পক্ষে শিশুশ্রম নিরসন এবং শিশুদের অধিকার রক্ষায় অঙ্গীকার করেন।

শিক্ষার্থীদের পুরস্কারের জন্য ১১ লাখ বই দিয়েছে সেকায়েপ

মাধ্যমিক শিক্ষায় মানোন্নয়নে 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস অ্যানহান্সমেন্ট প্রজেক্ট' (সেকায়েপ) পুরস্কার

১৯ নভেম্বর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত সেকায়েপ কর্তৃক ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কারের বই হস্তান্তর অনুষ্ঠান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

হিসেবে স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের বিতরণ করার জন্য প্রায় ১১ লাখ বই বিশ্ব সাহিত্যর কেন্দ্রের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে। ১৯ নভেম্বর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বই হস্তান্তর অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। জগৎকে জানতে হলে পাঠ্যবইয়ের বাইরে আরো বই পড়তে হবে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এর বিকল্প নেই। পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৭ সালে ২২ লাখ শিক্ষার্থী বই পড়ায় অংশ নিয়েছে।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

১০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ হচ্ছে বস্তিবাসীদের জন্য

সরকার বস্তিবাসীর জন্য মিরপুরে বাউনিয়ায় ১০ একর জমির ওপর ১০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করছে। ৫৫০টি ফ্ল্যাটের নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। খুব অল্প ও সহজে পরিশোধযোগ্য ভাড়াভিত্তিতে এসব ফ্ল্যাটে বস্তিবাসীরা থাকবে। দারুস সালামে হাইজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বস্তিবাসীদের জন্য আরো ১ হাজার ৫৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন সম্প্রতি ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ আয়োজিত 'হাউজিং ফাইন্যান্স ফর পিপল লিভিং ইন আরবান পোভার্টি' শীর্ষক জাতীয় কনভেনশনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গ্রামে যত্রতত্র বাড়িঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিন ২৩৫ হেক্টর কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছে। এটা কোনোভাবে দেশের জন্য মঙ্গল নয়। তাই গ্রামেও এখন বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কৃষিজমি রক্ষা করতে হবে।

সরকার পল্লি জনপদ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ বলেছেন, বর্তমান সরকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবনবিশিষ্ট পল্লি জনপদ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকল্পিত আবাসন সুবিধা প্রদানে মডেল হিসেবে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছে।

ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের কষ্ট করে উপজেলা সদরের ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলতে হবে না। মন্ত্রী ২০ অক্টোবর দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন উদ্‌বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সব জেলায় উপজেলা বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে এবং সারাদেশে সব বধ্যভূমিতে একই রকম স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। একই ডিজাইনে সব মুক্তিযোদ্ধাদের কবর হবে। যাতে মানুষ দেখে সহজে চিনতে ও বুঝতে পারে যে, এটা মুক্তিযোদ্ধার কবর। এছাড়া পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযোদ্ধাদের গর্বিত সাফল্যের কথা থাকবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও ধারণা পাবে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

৪০ হাজার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ

ঢাকায় কর্মরত শতকরা ৪০ ভাগ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে এ সুবিধা গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে মাত্র আটভাগ সরকারি-কর্মকর্তা কর্মচারী আবাসনের সুবিধা পান।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন। গণপূর্ত অধিদপ্তর এসব ভবন নির্মাণ করছে। মন্ত্রী আগারগাঁও আজিমপুর ও মতিঝিলে নির্মাণাধীন ভবনগুলো পরিদর্শন করেন।

বর্তমান পুরাতন ভবনগুলো ভেঙে সুউচ্চ বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে। এর ফলে কম জমিতে অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর আবাসিক সুবিধা গড়ে তোলা হবে। নির্মাণাধীন প্রতিটি ভবনে পৃথক স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন এবং সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তর ঘেঁষে পায়ে হাঁটার পথ নির্মাণের নির্দেশ দেন।

আগারগাঁও এলাকায় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ১৫ তলার আটটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে মোট ৪৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বসবাস করতে পারবে।

আজিমপুরে ২৪৮ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ছয়টি ২০ তলা ভবন নির্মাণ হচ্ছে। এসব ভবনে মোট ৪৫৬ পরিবার বসবাস করতে পারবে। মতিঝিলে ৪টি ২০ তলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব ভবনে ৫৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বসবাস করতে পারবে। ২০১৮ সালের মধ্যে এসব ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হবে।

১০ লাখ দুস্থ নারী পাচ্ছেন ৩০ কেজি করে চাল

বর্তমান সরকার সুবিধা বঞ্চিত দুস্থ নারীদের উন্নয়নে ভলনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশের ১০ লাখ দুস্থ নারীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ১৪ নভেম্বর ঢাকায় আগারগাঁও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে নেদারল্যান্ড সরকারের সখি প্রকল্প ও আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট আয়োজিত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এলজিআরডি ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ এসব কথা বলেন। **প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ**

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

ওষুধ রপ্তানিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ

ওষুধ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এখন দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ মিটিয়ে বিশ্বের ১২৭ দেশে বাংলাদেশে প্রস্তুত ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে। এছাড়া ওষুধ প্রযুক্তি ও কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরেই প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার ওষুধের বাজার। আর ৬৫০ কোটি টাকার

ওষুধ রপ্তানি হয়। ওষুধ ব্যবসায়ীরা জানান, বর্তমানে দেশের দেড় শতাধিক প্রতিষ্ঠান ৫ হাজার ব্র্যান্ডের ৮ হাজারের বেশি ওষুধ উৎপাদন করছে, যার মধ্যে বড়ো ১০ কোম্পানি দেশের চাহিদার ৮০ শতাংশ মিটিয়ে থাকে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, সুইডেন, ইতালি, কানাডা, স্পেন, নেদারল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে। বড়ো ২০ কোম্পানি বিবেচনায় নিলে তারা মোট চাহিদার ৯০ শতাংশ সরবরাহ করছে। আর ৪০ কোম্পানি ১৮২টি ব্যান্ডের সহস্রাধিক রকমের ওষুধ রপ্তানি করে।

সম্প্রতি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য মতে, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে ১ কোটি ৫৭ লাখ ডলারের ওষুধ রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১৫ দশমিক ৬৩ শতাংশ বেশি। তাছাড়া ওষুধ শিল্পের উদ্যোক্তারা বলেছেন, স্বল্প মূলধন ও ওষুধের গুণগত মান বজায় রাখায় বিদেশি বাজারে দেশীয় ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। এছাড়া অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ওষুধের দাম তুলনামূলক কম এবং মানসম্মত। আগামী ১০ বছরের মধ্যে বিশ্বের ওষুধ বাণিজ্যের ১০ শতাংশ দখল করা সম্ভব। এতে ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলার।

৫ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান পেল এইচএসবিসি অ্যাওয়ার্ড

সেরা ৫ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করল বহুজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দি হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (এইচএসবিসি)। ১৭ নভেম্বর ২০১৭ রাজধানীর র‍্যাডিসন হোটেলে এক অনুষ্ঠানে 'এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' শীর্ষক এ পুরস্কার দেওয়া হয়। রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধ করতে ২০১০ সাল থেকে নিয়মিত এইচএসবিসি এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। মোট ৫ শ্রেণিতে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এবারের বিজয়ী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: তৈরি পোশাক শিল্প শ্রেণিতে যথাক্রমে 'স্কয়ার ফ্যাশনস লিমিটেড', ও 'তারশিমা অ্যাপারেল লিমিটেড'। সরবরাহ ব্যবস্থা ও পশ্চাদমুখী শিল্প শ্রেণিতে 'এনভয় টেক্সটাইল'। সনাতন ও উদীয়মান শ্রেণিতে সি ফুড রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান 'সীমার্ক (বিডি) লিমিটেড' এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প শ্রেণিতে 'ক্ল্যাসিক্যাল হ্যান্ডমেড প্রোডাক্টস বাংলাদেশ'।

এ সময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। তিনি বলেন, পোশাক খাত খুবই ভালো করছে। সবুজ কারখানা করতে সরকার শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে চাই। এর মধ্যে পোশাক খাত থেকে আসবে ৫০ বিলিয়ন ডলার। **প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে**

মাদকককে 'না' বলো

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশে প্রথমবার কারাগারে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

মাদকাসক্ত বন্দিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সর্বোচ্চ চিকিৎসার জন্য আধুনিক 'মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র' নির্মাণ করা হচ্ছে দেশের ৬৮টি কারাগারে। একই সাথে কারাবন্দি নারী-পুরুষ, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় নাগরিকদের প্রাথমিকসহ সব প্রকার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট ডিজিটাল সুবিধা সমৃদ্ধ 'কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল' নির্মাণ করা হচ্ছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জের কারা সীমানায় সারাদেশ থেকে আসা বন্দির দ্বিতীয় পর্যায়ের চিকিৎসা প্রদানের জন্য এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছে 'কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র'। বন্দির সুচিকিৎসার জন্য ২৭৯ কোটি টাকা ব্যয়িত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

দেশের সব কারাগারে আটক গড়ে প্রায় ৭০ হাজার বন্দির মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশের অধিক সরাসরি মাদকাসক্ত। কোনো কোনো সময় এই হার ১৫ শতাংশও ছাড়িয়ে যায়। এই প্রকল্পের অধীনে সারাদেশের কারা হাসপাতালের স্টাফদেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর ফলে কারাগারের বন্দিদের মাঝে মাদকাসক্তের হার অনেকটাই কমে আসবে বলে আশা করেন করাকর্তৃপক্ষ।

কারা অধিদফতরের হিসাবে মোট কারাবন্দির মধ্যে শতকরা ১০ ভাগের বেশি সরাসরি মাদকাসক্ত। এসব মাদকাসক্ত কারাবন্দিদের মধ্যে প্রায় ৪২ ভাগই যুবক-যুবতী, যাদের বয়স ২৫ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে। এছাড়া ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে কিশোর মাদকাসক্ত বন্দি প্রায় ২৭ শতাংশ। ৩৫ থেকে ৪৪ বছর কারাবন্দি রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে ৪৫ থেকে ৫৪, ৫৫ থেকে ৬৪ এবং ৬৫ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স তারা। দীর্ঘদিন কারাগারে থাকার কারণে একসময় এসব বন্দিরা মানসিক হীনমন্যতায় ভোগে। পরবর্তীতে দেখা যায় তারা মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাদকাসক্তির দ্বিতীয় ধাপ মানসিক রোগ। এ কারণেই কারাগারে যেসব মাদকাসক্ত বন্দি আসে, দীর্ঘদিন কারা অভ্যন্তরে আটক থেকে সৃষ্ট নানা সমস্যার কারণে একপর্যায়ে সেসব বন্দিই মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই মাদকাসক্ত কারাবন্দিদের দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছানোর আগেই যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলে এ সমস্যার সমাধান অনেকাংশেই সম্ভব হবে। আবার সুস্থ হওয়ার পর এসব মাদকাসক্ত বন্দি যখন কারাগার থেকে মুক্তি পাবে তখন তাদের আবার মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না বললেই চলে। তাই 'কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র' দেশের কারাবন্দিদের জীবনে সুফল বয়ে আনবে। আশা করা যাচ্ছে, ২০২০ সালের জুনে এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে। **প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন**

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

অপারেশন জ্যাকপট-এর ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণ করবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌকমান্ডোদের দ্বারা পরিচালিত অপারেশন জ্যাকপট- এর ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ১৯৭১- এর সংঘবদ্ধ যুদ্ধের সত্য ঘটনা অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ হবে। চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন গিয়াসউদ্দিন সেলিম।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ১৬ দিনের চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হয় ২১ অক্টোবর। ৬ অক্টোবর শুরু হয় 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭'। দেশের ৬৪টি জেলায় একযোগে ৪৪টি

জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭

সিনেমা নিয়ে এ উৎসব চলে। সমাপনী দিনে উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচিত্রের পুরস্কার পায় তৌকীর আহমেদ পরিচালিত *অজ্ঞাতনামা* ও বিশেষ জুরি পুরস্কার জেতে রুবাইয়াত হোসেন পরিচালিত *আন্ডার কনস্ট্রাকশন*।

দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এই চলচ্চিত্র উৎসবে ৫টি বিভাগে ভাগ করে দেখানো হয় সিনেমা। বিভাগগুলো ছিল– বাংলাদেশ ধ্রুপদী চলচ্চিত্র, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বা পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র, সমকালীন দেশীয় চলচ্চিত্র (২০১৫-১৬) ও নারী নির্মাতাদের নির্মিত চলচ্চিত্র।

_ঢাকা অ্যাটাক_ চলচ্চিত্রটি এবার ইতালিতে

পরিচালক দীপঙ্কর দীপন পরিচালিত *ঢাকা অ্যাটাক* চলচ্চিত্রটির বিশ্ব সফর অব্যাহত রয়েছে। এ সফরের অংশ হিসেবে ছবিটি এবার ইতালিতে মুক্তি পেয়েছে। দেশটির রোম, মিলানো, ভেনিস, তুরিনসহ বিভিন্ন শহরে ১০ নভেম্বর থেকে মুক্তি পেয়েছে থ্রিলারধর্মী এই ছবিটি।

বাংলাদেশে প্রথম পুলিশ অ্যাকশন থ্রিলার ছবি *ঢাকা অ্যাটাক*। শুভ-মাহি ছাড়াও ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন– সৈয়দ হাসান ইমাম, আলমগীর, আফজাল হোসেন, এবিএম সুমন, শতাব্দী ওয়াদুদ, নওশাবা, শিপন মিত্র প্রমুখ। এ বছরের আলোচিত এ ছবিটি প্রযোজনা করেছে বাংলাদেশ পুলিশ পরিবার, ফ্ল্যাশ মাল্টিমিডিয়া ও থ্রি হুইলারস লিমিটেড। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মধ্যপ্রাচ্যে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে।

-বুসান চলচ্চিত্র উৎসবের ২২ তম আসরে ডুব

দক্ষিণ কোরিয়ায় বসে বুসান চলচ্চিত্র উৎসবের ২২ তম আসর। ১২ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত চলে এ উৎসব। এ উৎসবে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পরিচালিত *ডুব* চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

প্রতিবেদন : মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

এশিয়ান আরচ্যারি চ্যাম্পিয়নশিপে কোয়াটার ফাইনালে বাংলাদেশের মামুন

তীর-ধনুকের (আরচারি) খেলাটি এখন বাংলাদেশে সবার কাছে পরিচিত। তবে খেলাটিতে কীভাবে প্রতিযোগিতা হয় সে বিষয়ে অনেকেই অজ্ঞ হলেও প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ অনেকটা এগিয়ে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে বাংলাদেশ আনসারের আরচার আবুল কাশেস মামুন ইতোমধ্যে শেষ আটে পৌঁছে গেছেন। তার এই সাফল্যে উৎসবে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়েছে। বিশ্বমানের স্কোর করেছেন মামুন। বাংলাদেশের আনন্দ-বেদনার দিনে পদক জয়ের ঘটনাও আছে। ইতোমধ্যে দুটি স্বর্ণজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে– দুটিই জিতেছে কোরিয়া তিরন্দজরা। একদিন বাংলাদেশও অনেকদূর এগিয়ে যাবে, গড়বে স্বর্ণজয়ের ইতিহাস এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শেষ চারে লড়াইয়ে টিকে থাকল রাজশাহী

বিপিএল-এ অনেক নামিদামি তারকারা ক্রিকেটকে আনন্দমুখর করে তুলেছে। বাদ পড়ার আশঙ্কায় ছিল পদ্মাপারের তারকাসমৃদ্ধ দলটি। রাজশাহী কিংস চিটাগাং ভাইকিংসের মুখোমুখি হয়ে ৩৩ রানে পরাজিত করে চিটাগাং ভাইকিংসকে এ বছরের বিপিএল থেকে বাদ পরার চূড়ান্ত করে দিল। পাশাপাশি রাজশাহী কিংসের শেষ চারে যাওয়ার সম্ভাবনা আরো আলোকিত হলো। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াইয়ে মরিয়া পদ্মাপাড়ের এই দলটি।

পয়েন্ট তালিকায় এ পর্যন্ত শীর্ষে আছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। সাকিবের ঢাকা ডায়নামাইটসকে পরাজিত করে তারা শীর্ষে। যার ফলে খুলনাকেও তারা পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে কুমিল্লা, খুলনা এবং ঢাকা শেষ চারে খেলা নিশ্চিত করেছে। শেষ পর্যন্ত রংপুর, সিলেট এবং রাজশাহী-এর যে-কোনো একটা শেষ চারের ক্রিকেটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াইয়ে সবগুলো দলই মরিয়া হয়ে লড়বে। ছক্কা, চারের টান টান উত্তেজনায় ক্রিকেট প্রেমিরা মেতে উঠবে উচ্ছ্বসিত আনন্দে। **প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী**

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজংগী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এসকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে, কিনবে লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস ।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 38, No. 06, December 2017, Tk. 25.00

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা